শনিবারের চিঠি

৯ চৈত্র ১৩৯১ □ ২৩ মার্চ ১৯৮৫

'সঞ্চয়িতার টাকা ফেরত দেওয়া হবে'

পুরান দিনের বিধানসভা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

স্ক্যান ঃ রূপালী গোশাভী

হার্ডকপি ও এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত)।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত)।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত)।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

* বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত :
রবীন্দ্র-রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা-২৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা-৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত।। অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ রায়।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি।। বনফুল।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ড: সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস–বনফুল হাটেবাজারে ৮ টাকা।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা।। অধিক লাল ১০ টাকা।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু বাসর ঘর ১০ টাকা।। লাল মেঘ ১০ টাকা।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা।। যখন বসন্ত ১০ টাকা।। স্মৃতি সততই সুখের।। (আমেরিকা ও ইউরোপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদবধূ ১২ টাকা।। কর্ণাটরাগ ৮ টাকা।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা।।

* কবিতা–অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা।। নীল আকাশ ৮ টাকা।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু শীতের প্রার্থনা-বসন্তের উত্তর ১০ টাকা।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট।। কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

মরজি মহল □ বনফুল ২২

নূপুরের মত □ অনুলিখন অনুপমা দাশ ৪২

কেনারামের ওভারকোট ও আহ্লাদির কুকুর □ রূপক গুপ্ত ১৬

পুরাতনী ঃ ঘুঘুর ডাক □ শ্রী ঝটকেশ্বর শর্মা ২৬

টরা-ইয়ানি □ বাসুদেব বসু ২৮

প্রচ্ছদ কাহিনী ঃ 'সঞ্চয়িতার টাকা ফেরত দেওয়া হবে' □ দিলীপ রায় চৌধুরী, উদয়ারুণ রায়, অজিত চক্রবর্তী ৫

পুরানো দিনের বিধানসভা □ শুভাশিস মৈত্র ৩২

হাওড়া পৌরসভা ঃ লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় □ অমিত মুখার্জি ৩

আইনে ও অবহেলায় বন্দী মেয়েদের খেলার মাঠ □ মালা দত্ত ৩৬

নকশাল আন্দোলন ও বিদেশী অর্থ □ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ৩৯

তৃতীয় জোট এস. ইউ. সি.? □ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ৪০

আবাসন পরিকল্পনা ভেস্তে দিচ্ছে মস্তানরা □ শুভাশিস মৈত্র ৪৬

সংবাদ-সাহিত্য □ ৪৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা □ আশিস মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য ছবি □ কবীর আইচ, শিখর কর্মকার, প্রবীর দাস, জয়ন্ত শেঠ

২৩ মার্চ, ১৯৮৫ সংখ্যা থেকে কলকাতা ও হাওড়ার একমাত্র পরিবেশক পাতিরাম বুক স্টল (শ্যামল ভট্টাচার্য) নিযুক্ত হলেন।

এই সংখ্যায়

হাজার হাজার মানুষের শেষ সম্বল নিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানায় যে ব্যাংকিং সংগঠন গুলো গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সঞ্চয়িতা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সঞ্চয়িতার লুঠের ইতিহাস সবার জানা। এই প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয় সঞ্চয়িতার মালিক শম্ভু মুখার্জীর জীবনের অন্য এক দিক, সঞ্চয়িতা তদন্ত কমিশন কতদূর এগোল এবং কি ভাবে সঞ্চয়িতার গ্রাহকদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

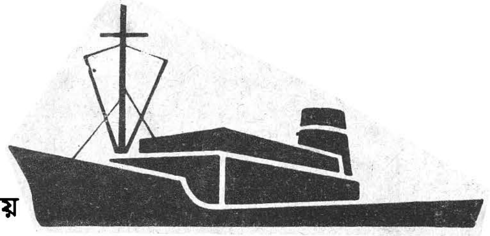

আগামী সংখ্যায়

কলকাতা বন্দর কি তলিয়ে যাচ্ছে? চোরা-কারবার আর কালো টাকার ছায়ায় ঢাকা পড়েছে কলকাতা বন্দর। প্রশাসনের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল চোরাই মালের বাজার। কলকাতা বন্দরের পুলিশ ও প্রশাসনের সম্পর্ক। কলকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচলের সমস্যা। চুরি। বাংলাদেশের প্রাচীনতম শ্রমিক ইউনিয়ন, কলকাতা বন্দরের শ্রমিক সংগঠনের ইতিহাস। জাহাজ ব্যবসায়ের লাভ, ক্ষতি, ভবিষ্যৎ। এই হল শনিবারের চিঠির আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয়।

বনফুল প্রকাশণী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত। কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন

দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর নয়া দিল্লি ১১০০২৪ ফোন ৬৯৭৬৭১,

ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

দাম: দু'টাকা

পূর্বাঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৩৫ পয়সা

পূর্বাঞ্চল ও কলকাতা বাদে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৫০ পয়সা

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যা

৯ চৈত্র, ১৩৯১ □ ২৩ মার্চ, ১৯৮৫

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস; সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ

প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

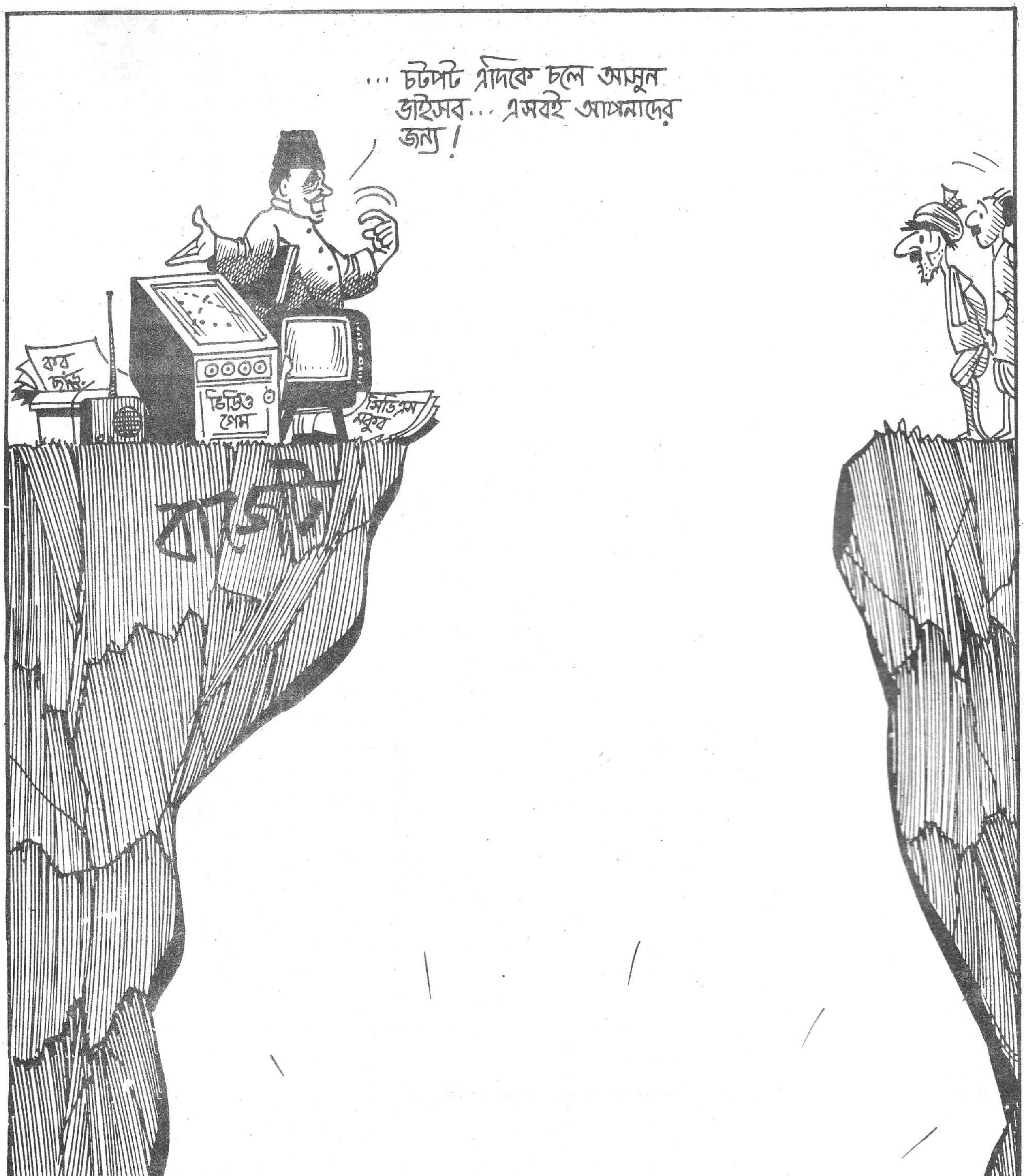
... চটপট এদিকে চলে আসুন ভাইসব... এসবই আপনাদের জন্য !
কর ছাড়
ভিডিও গেম
বাজেট
ঘাটতি ৩৩৪৯ কোটি টাকা

হাওড়া পৌরসভা : লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয়

অমিত মুখার্জি

কি ধরণের কচ্ছপ গতিতে রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলোতে কাজকর্ম চলে তার নমুনা প্রায় সকলেরই জানা। তবে বিভিন্ন পৌর সংস্থাগুলো ঠিক কোন পর্যায়ে পড়ে তা অনেকেই গুলিয়ে ফেলেন। কারণ কলকাতা পৌরসভায় যখন 'কাজের জোয়ার' এসেছে তখন ঠিক পাশের হাওড়া পৌরসভার চিত্রটা যেন একটু ভিন্ন, কেমন ঘোলাটে ধরণের। হাওড়া স্টেশন থেকে ফ্লাই-ওভার বরাবর পৌরভবনের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া বেশ

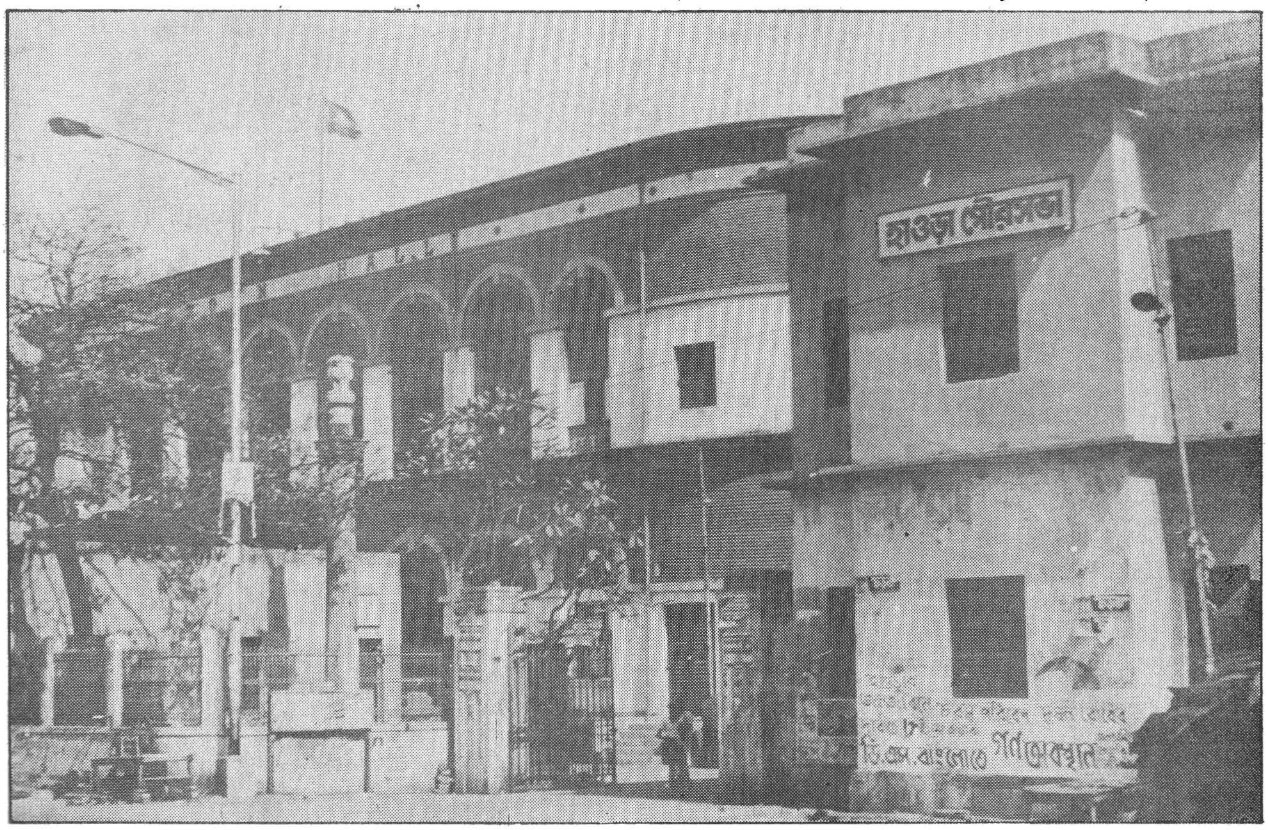

হাওড়া পৌর সভার বাড়ি

দুষ্কর ব্যাপার। নাকে রুমাল গুজেও পথের দুধারে বহু দিনের জমে থাকা পচা আবর্জনার গন্ধে পথ অতিক্রম করাও দু:সাধ্য। তবু নিত্যযাত্রীদের অনেকেই এই দু:সাধ্য সাধন করছেন মুখ বুজে। এই স্তূপীকৃত জঞ্জাল সম্পর্কে হাওড়া পৌরসভার মেয়র আলোকদূত দাসের বক্তব্য: ঐ অঞ্চলে সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন হাট বসে। হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে, ফলে আবর্জনা তো জমবেই। তবে মাঝেমাঝে আমরা জঞ্জাল সাফ করি বৈকি। কিন্তু একেবারে জঞ্জাল মুক্ত করা অসম্ভব।

কোনক্রমে পথ পেরিয়ে পৌরভবনের চত্বরে পা রাখলেই একটি অতি পরিচিত দৃশ্য চোখে পড়ে। মিছিল, মিটিং, স্লোগান, ঘেরাও প্রভৃতি নিত্য কাজের অংশ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। আর যারা প্রত্যক্ষভাবে বিক্ষোভে অংশ নেন না তারাও ভিড় জমায় বিভিন্ন বারান্দায়। বোধহয় এসব উপভোগ করার উদ্দেশ্যেই। ফলে কাজের সুস্থ পরিবেশ মার খায়। কিন্তু এই পরিবেশ গড়ে উঠল কেন? কেন কর্মীরা কাজের সময় মিছিল মিটিং করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হাওড়া পৌর কর্মচারী সংগ্রাম কমিটির অন্যতম নেতা নির্মল সরকার বললেন: "বহুদিন থেকে প্রভিডেন্ট ফ্যান্ড (পি. এফ) কোয়াপারেটিভ এবং জীবনবীমার টাকা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট জায়গায় জমা দেন না। সেই টাকা পরিমাণে বাড়তে বাড়তে এখন লাখের অঙ্কও ছাড়িয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকবার দরবার করেও কোন লাভ হয়নি। ফলে কর্মীদের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট ও চরম সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। অবশেষে তাই আমাদের এই পথ ধরতে হল।"

অবশ্যই একদিনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি। সংগ্রাম কমিটির মতে, '৭০-এর দশকের শুরু থেকেই এই সমস্যার উদ্ভব। হাওড়ায় তখন ভয়াবহ অবস্থা। টাকা সংগ্রহকারীরা বাইরে থেকে টাকা তুলতে পারতেন না। কয়েক জায়গায় সংগ্রহকারীরা দুর্বৃত্তদের হাতে প্রহৃতও হন। সেই থেকে পি. এফ. সংগ্রহ অনিয়মিত হয়ে যায়। ফলে ঘাটতির অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ লক্ষ টাকা।

কর্মীদের কোঅপারেটিভ ও জীবনবীমার বর্তমান (জানুয়ারী ১৯৮৫) ঘাটতির পরিমাণ যথাক্রমে ৭ লক্ষ ও ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। প্রতি মাসেই কর্মীদের মাইনে থেকে এই বাবদ টাকা কেটে নেওয়া সত্ত্বেও কেন এই ঘাটতি? নির্মলবাবুর অভিযোগ: প্রতি মাসে কোঅপারেটিভ ও জীবনবীমা বাবদ মোট টাকা ওঠে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ও ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু এই টাকা যাচ্ছে কোথায়? তিনি আরো বললেন, কোঅপারেটিভে ঘাটতির জন্য তারা সুদ হারাচ্ছেন প্রতি মাসে ৭ হাজার টাকা।

স্বভাবতই কর্মচারীরা ঠিক মত লোনও পাচ্ছেন না। তার মতে, জীবনবীমা আইন অনুযায়ী তিন মাসের বেশী 'প্রিমিয়াম' বাকি পড়লে 'পলিসি' নষ্ট হয়ে যায়। এখনও কিন্তু বাকি পড়ে আছে সাত মাসের 'প্রিমিয়াম'। এই সেদিন ১৯৮৪-এর মে মাসের 'প্রিমিয়াম' দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানালেন। অনেকেরই প্রশ্ন, মাস মাইনে থেকে কেটে রাখা টাকাগুলো নিয়ে কি

হচ্ছে ?।

হাওড়া পৌরসভা কর্মীদের পি. এফ. -এর ব্যাপক ঘাটতি মেটাতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সাথে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন জরুরী অবস্থার পর। সেই বৈঠকে তৎকালীন দুই মন্ত্রী গোপালদাস নাগ ও সুব্রত মুখার্জীর উপস্থিতিতে স্থির হয় যে হাওড়া পৌরসভা মাসে মাসে সরকারের থেকে পাবে ১০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় বকেয়া ও বর্তমান পি-এফ-মেটাতে এবং ২ লক্ষ টাকা রাস্তা ও জল ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে। বাকি ৭ লক্ষ টাকার বরাদ্দ থাকে যদি মাইনের ঘাটতি পড়ে তা মেটাতে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে। উপরিউক্ত তথ্যগুলো জানিয়ে নির্মলবাবু বললেন: ঠিক মত টাকা দেওয়া হলে পি. এফ. ঘাটতি ৯০ মাসের মধ্যে মিটে যেত। কিন্তু বাস্তবে কি হল? বর্তমানে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশী।

কংগ্রেস রাজত্বের শেষ দিকে হাওড়া পৌরসভার কাজকর্ম চালানোর উদ্দেশ্যে গঠিত হয় কার্যনির্বাহক বডি। এই বডি-র প্রধান কার্যনির্বাহক অফিসার নিযুক্ত হলেন কংগ্রেসী বলে পরিচিত মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের পর তাকে সরিয়ে আনা হল অমিত কুশারীকে। ইনি আই এ এস অফিসার। আবার ঐ বছরের আগস্টেই গঠন করা হল ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট অ্যাডভাইসরি বোর্ড। বোর্ডের সব সদস্যই ছিলেন বামফ্রন্টের লোক। এই বোর্ড কাজ চালায় সাত মাস। ১৯৭৮-এর ১লা মার্চ এই বোর্ড ভেঙ্গে গঠিত হয় ৩০ জন সদস্যের নমিনেটেড বোর্ড। পৌরসভার বর্তমান মেয়র আলোকদৃত দাস হলেন এই বোর্ডের সভাপতি। ৮৪-র পৌর নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল এই বোর্ড। সংগ্রাম কমিটির মতে, বকেয়া পি. এফ. ঘাটতি মেটাতে প্রতি মাসে ১লক্ষ টাকা ঠিকভাবেই দেওয়া হয়েছিল অমিত কুশারীর সময় পর্যন্ত। ফলে ঘাটতির পরিমাণ নেমে আসে ৯০ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষ টাকায়। কিন্তু নমিনেটেড বোর্ডের কার্যকালে এই বকেয়া ঘাটতি পরিশোধ আবার অনিয়মিত হয়ে যায় বলে সংগ্রাম কমিটির অভিযোগ। যদিও প্রতি মাসে রাজ্য সরকারের থেকে ১০ লক্ষ টাকা পেয়ে আসছিল আগের মতই। নিয়মিত টাকা জমা না পড়ায় পি. এফ. ঘাটতির বর্তমান পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশী। এই বিষয়ে উল্লেখ্য যে ৮৩ সালের আগস্ট মাস থেকে হাওড়া পৌরসভাকে প্রতি মাসে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া বামফ্রন্ট সরকার বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ পৌরসভার অর্থনৈতিক অবস্থা আরো দুরুহ সংকটে পড়ে।

হাওড়া পৌরসভার মেয়র আলোকবাবুর কিন্তু এসব অভিযোগের অনেকটাই অস্বীকার করছেন। তার মতে, ঐ ১০ লক্ষ টাকা কিভাবে খরচ করা হবে সে বিষয়ে রাজ্য সরকার কোন 'ইয়ারমার্ক' করে দেন নি। ৬৭ সাল থেকে ৮২-এর জুন মাস পর্যন্ত সব টাকা তারা মিটিয়ে দিয়েছেন বলে তিনি দাবী করেন। তার মতে, এখন পি. এফ. ঘাটতির পরিমাণ দাড়িয়েছে ১ কোটি ১০-১৫ লক্ষ টাকা, জীবনবীমা বাবদ টাকা বাকি আছে তিন-চার মাসের এবং কোয়াপারেটিভের সামান্য এক আধমাসের। কিন্তু নিয়মিত টাকা পরিশোধ করে থাকলে কেন ঘাটতির পরিমাণ ৯০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ কোটি ১০-১৫ লক্ষে (মেয়রের মতে) পৌঁছায়, তার সঠিক উত্তর আলোকবাবু দিতে পারেন নি।

এদিকে উত্তরোত্তর ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পৌরকর্মীরা আশঙ্কিত। হাওড়া পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের কাউনসিলার সোমেন দে এ প্রসঙ্গে বললেন: পৌরসভার ৫০০ জন কর্মী অবসর নেওয়ার পরও প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাওনা টাকা পাচ্ছেন না। টাকা পেতে এক-একজনের সময় লাগছে তিন থেকে সাত বছর। ফলে অনেকের সংসারেই হাড়ির হাল।

দীর্ঘকালের এইসব দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে পৌরকর্মীরা ইতিমধ্যে তিন-তিনটি ধর্মঘট করেছেন বলে সংগ্রাম কমিটি জানালেন। ১৯৮০, ৮৩ এবং ৮৪ সালে পৌরসভার ধর্মঘট হয়েছিল যথাক্রমে ৫৩ দিন, ২২ দিন এবং ৫৬ দিন। যদিও শেষ দুটি ধর্মঘটে পূজা এক্সগ্রাসিয়াও অন্যতম দাবী হিসাবে স্থান পায়। তাছাড়া ২২/১০/৮৪ তারিখে পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই সুবিশাল ঘাটতি পূরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আবেদন করেন সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা। তাদের দাবী খতিয়ে দেখবেন বলে প্রশান্তবাবু আশ্বাসও দিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত কিন্তু তেমন কোন ফল পাওয়া যায় নি বলে সংগ্রাম কমিটির নেতা নির্মলবাবু অভিযোগ করলেন। তিনি আরো বললেন: ২৫/১/৮৫ তারিখে একটি চিঠি মারফত প্রশান্তবাবুকে তাদের দাবী পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতেও কোন কাজ না হলে চরম আন্দোলনের পথে তারা পা বাড়াবেন বলে জানা গেল। তবে এই রকম আন্দোলন কি নিয়মিত কর্মবিরতি নাকি আবার অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট, সে বিষয়ে পরিস্কার কোন চিত্র এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।□

আধুনিক মেশিনারীতে
তৈরী মোজা
বাপির এক নতুন অবদান

Bapi REGD.

সূতী, মার্সেরাইজড ও নাইলনে তৈরী
বিভিন্ন মনমাতানো রঙে পাওয়া যায়।

PRASA/HT-5/83

HINDUSTHAN TEXTILE CALCUTTA-5
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল কলিকাতা-৭০০ ০০৫

প্রচ্ছদ কাহিনী

সঞ্চয়িতার টাকা ফেরত দেওয়া হবে

দিলীপ রায় চৌধুরী

সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টের আমানত-**কারীদের মুখে এখন** একটাই জিজ্ঞাসা: **আমানতের টাকা ফেরত** পাওয়া যাবে তো? **যদিও বা পাওয়া যায়,** তবে কত শতাংশ? **আর তা কবে?** এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কে **দেবে? প্রকৃতপক্ষে যাঁদের** এর উত্তর দেবার কথা তাঁদের প্রধান শম্ভুপ্রদাস মুখার্জী মৃত আর অন্য দু-জন বিহারীলাল মুরারকা ও স্বপন গুহ বেপাত্তা। স্বভাবত:ই এর দায়িত্ব পড়েছে শ্রী এন. সি. দত্ত মহাশয়ের উপর। কারণ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার হিসেবে তিনিই এখন এই সংস্থার কর্ণধার। তাই প্রতিদিনই তাঁর অফিসে বহুলোকের আনাগোনা। শুধু একটু আশার কথা শোনবার জন্য।

ভীড় হবেই বা না কেন? দেখতে দেখতে কমিশনারের কার্যকাল প্রায় দু'বছর হতে চলল। এরই মধ্যে তাঁর কর্মধারায় একটি সাড়া জেগেছে। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশমত আমানতকারীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে পাওনার পরিমাণ নিরূপণের জন্য। দাবি জানিয়ে দরখাস্ত করেছেন প্রায় ২ লাখ আমানতকারী। এখনও দাবির সঠিক অংক পাওয়া যায় নি। কমিশনারের মতে তা ১০০ কোটি টাকার বেশিই হবে। জানা গেল ২ হাজার থেকে ২০ হাজারের দাবিদারের সংখ্যাই শতকরা ৮০ ভাগ। সুপ্রীম কোর্টে পেশ করবার জন্য হিসাব-নিকাস চলছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে আসবে যা দিয়ে এই দাবি মেটানো সম্ভব হবে? এর উত্তরে কমিশনার দত্ত জানালেন দাবির পরিমাণ পূর্ণভাবে মেটানো যাবে কিনা তা এখনই বলা যাবে না, তবে টাকা ফেরত দেওয়া যাবে।

কমিশনার দত্তর এই আশ্বাসবানীর ভিত্তি কি? ১৯৮৩ সালের ১৭ জুন যখন কার্যভার গ্রহন করেন তখন কমিশনারের হাতে এসেছিল রাজ্যসরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা ৫২ লাখ টাকা। আজ এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৫ লাখ টাকায় অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় ১ টাকা দেওয়াও এখন সম্ভব নয়। স্বভাবত:ই আমানতকারীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। মন্ত্রী, এম. পি. এম. এল.-এদের কাছে তাঁরা আকুল আবেদন রাখছেন। নাকতলা থেকে বাইশজনের মত আমানতকারী কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক সেনের কাছে এক আবেদনে বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত ১৬ জন কংগ্রেসী এম. পি কে সংগে নিয়ে তিনি যেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করেন। পত্রে আরও বলা হয়েছে, এই মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত'রা এবারে কংগ্রেসকে জিতিয়েছে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এরাই বামফ্রন্টকে পরাস্ত করে কংগ্রেসকে জয়ী হতে সাহায্য করবে। এদের আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচান। এই ধরণের আবেদনের মূল্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে কতখানি তা বলা সম্ভব না হলেও কমিশনারের কাছে এর যে মূল্য আছে তা আলোচনায় বোঝা গেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে আমানতকারীদের টাকা ফিরিয়ে দিতে তিনি কৃতসংকল্প যদি জনসাধারণের বিশেষ করে যাঁরা এই

সংস্থার গোপন খবর জানেন তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পান। এই সহযোগিতা ছাড়া সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা সঞ্চয়িতার বেনামি সম্পত্তির উদ্ধার কমিশনারের পক্ষে অসম্ভব।

সুপ্রীম কোর্টের আদেশের পর সঞ্চয়িতার বেনামি সম্পত্তি উদ্ধারে কমিশনার তৎপর হয়ে ওঠেন। গোপনসূত্রের খবরের ভিত্তিতে কলকাতা, বোম্বাই দিল্লি মাদ্রাজের বহু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ব্যাংক একাউন্ট লকার, ফ্ল্যাট বাড়ি, জমি, সিনেমাহল, গাড়ি, অলংকার, সিনেমা পরিবেশনার ব্যবসা, কোম্পানির শেয়ার প্রভৃতি। এর সবই সঞ্চয়িতার অংশীদার প্রোমোটার, এজেন্ট ও সাব-এজেন্টদের বেনামি সম্পত্তি। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির সবই সঞ্চয়িতার অর্থে তৈরি কিনা তার প্রাথমিক বিচার করছেন কমিশনার নিজেই। প্রতিবাদ উঠলে তবেই সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য পেশ করা হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিসন বেঞ্চের কাছে। ইতিমধ্যে শতাধিক ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে প্রায় ২৫ টি মামলা হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিসন বেঞ্চের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তিগুলোর কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কমিশনার অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। দেখা গেছে একই সম্পত্তি দু'বার কিংবা তিনবার হাত বদল হয়েছে শুধুমাত্র আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য। এই রকম একটি হাতবদলের কাহিনী জানতে পেরেছি যা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই কাহিনীটি সঞ্চয়িতার আমানতকারীদের জানা দরকার।

কাহিনীর সূত্রপাত ১৯৮১ সালের ১১ মে তারিখে। এর কিছুদিন আগেই সঞ্চয়িতার অফিসে রাজ্যসরকারের নির্দেশে পুলিশ ব্যাপক তল্লাসি চালায় এবং ৫২ লক্ষ টাকা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেন। শম্ভুপ্রসাদ মুখার্জি সহ অনেকেই গ্রেপ্তর হন। এর ফলে সঞ্চয়িতার পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে এক রিট্ আবেদন করা হয়। ওই আবেদনের শুনানি চলাকালেই ১১৩ পার্ক স্ট্রীটের নির্মীয়মান বহুতলা একটি বাড়ির ছয়তলা (১২২৫০ স্কো: ফিট্) এবং নীচতলার গাড়ি পার্কিং এর ৪ টি ঘেরা জায়গা (২৮৮ স্কো: ফিট্) বিক্রয়ের জন্য সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্ট আনন্দিলাল পোদ্দার এন্ড সন্স লি: এর সঙ্গে এক চুক্তি করে। দাম ঠিক হয় ছয়তলার জন্য ২৬৯৫০০০ টাকা এবং গাড়ি রাখার জায়গার জন্য ১৭৬০০০ টাকা। বাড়ি তৈরি হবার আগেই তড়িঘড়ি ছয়তলার পূর্ণ মূল্যই পোদ্দারদের দিয়ে দেওয়া হয়। চুক্তির শর্তে বলা আছে ঐ তলার বিক্রি, লীজ্ বা ভাড়া দেবার পূর্ণ

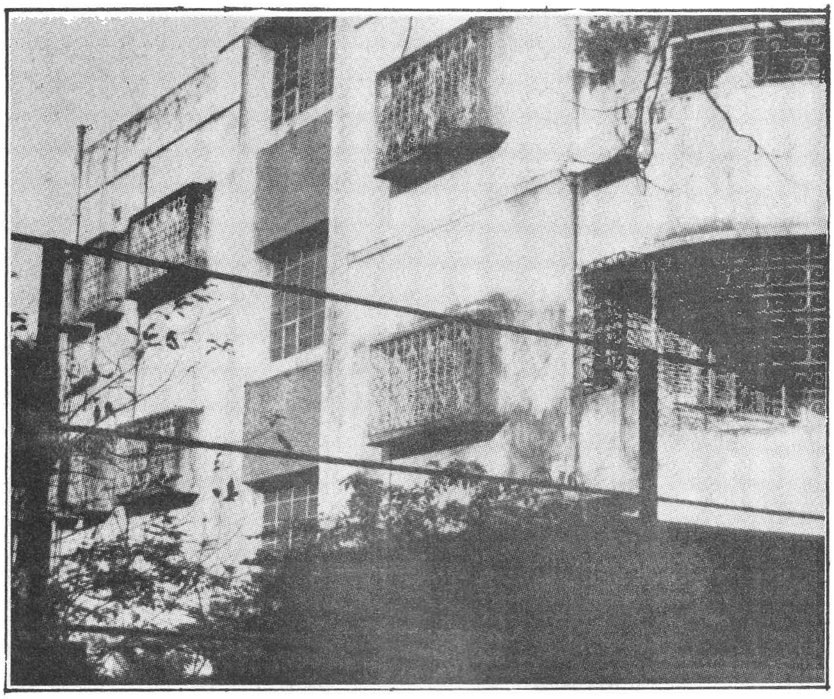

সঞ্চয়িতার অন্যতম অংশীদার তপন গুহর লেকটাউনের 'এ' ব্লক এর নিজস্ব বাড়ী (বিলাস বহুল বাড়ী)

অধিকার থাকবে ক্রেতার অর্থাৎ সঞ্চয়িতার।

এর পরের মজার ঘটনা হলো ভারত সরকারের সংস্থা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। হাইকোর্টে যে রীট্ আবেদনের শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৮২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টস্ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ধর্মতলা শাখায় ১ ফেব্রুয়ারি একটা কারেন্ট এ্যাকাউন্ট খুললেন। পরের দিনই সঞ্চয়িতার পক্ষ থেকে ব্যাংকের ঐ শাখার কাছে প্রস্তাব করা হলো ৩৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওভার ড্রাফট দেবার সুযোগ দিতে। ওভার ড্রাফটের জন্য ১১৩ পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির তথাকথিত ছয়তলা ও গাড়ি রাখার জায়গাকে জামিন রাখতে চাওয়া হল। ১৯৮২ সালের ৩১ জুলাই সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টস্ ও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের মধ্যে এক অদ্ভুত চুক্তি হল। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নাকি ব্যবসার রীতি অনুসারে সঞ্চয়িতাকে ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছিল। ঐ টাকা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। তাই চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্যাংক ১১৩ পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির তথাকথিত অংশের মালিক বলে দাবি করছে। ওভার ড্রাফটের ঐ লেনদেন ভন্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ধর্মতলা স্ট্রিট শাখার ম্যানেজার অমলেন্দু বিকাশ দাস ও সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টসের কয়েকজন অংশীদারের মধ্যে গোপন বোঝাপড়ার ফলেই হচ্ছে নাকি এই লেনদেন। উক্ত অমলেন্দু বিকাশ দাস একবার গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন।

১৯৮৪ সালের ২৪ এপ্রিল উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঐ বছরের ১৩ জুন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক হাইকোর্টে আবেদন করেন সঞ্চয়িতার অভিযোগ শুনানির জন্য হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিসন বেঞ্চ কমিশনারের পক্ষেই রায় দেন। নিজেদের বে-আইনি কাজ ঢাকতে ঐ ওভারড্রাফটের লেনদেনকে আইনসংগত বলে প্রতীয়মান করবার জন্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। সেখানেও ব্যাংকের পরাজয় ঘটে। উক্ত সম্পত্তি দু'সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করে কমিশনারকে একটি রিপোর্ট দিতে সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ দেন। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। চক্রান্তকারীদের শক্তি কমিশনারের থেকে খুবই বেশি। তাই নীলামের কাগজপত্র কিনে নিলামের দিনে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে উপস্থিত থেকেও একদল অবাঙালী ব্যবসায়ী নীলাম ডাকতে দেয়নি। অনুমান করা হচ্ছে দুপক্ষের যোগসাজসেই এটা হয়েছে। কমিশনার অফিসে জানা গেল সুপ্রীম কোর্ট আবার বিক্রির নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য এই সম্পত্তির আনুমানিক বাজার দর লাক্ষ টাকারও বেশি।

আর একটি উল্লেখযোগ্য মামলা হচ্ছে এই কলকাতা হাইকোর্টেই। এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে বোম্বাই-র জুহুবিচের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর জন্য কমিশনারকে সুদূর বোম্বাই পর্যন্ত ছুটে যেতে হয়। তপন গুহ-র সব বাধাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তবে হাত বদলের খেলায় এক্ষেত্রেও কমিশনার তাঁর প্রতিপক্ষের কাছে নাজেহাল হচ্ছেন। এই

সঞ্চয়িতার অফিস

সম্পত্তির বর্তমান বাজার দর হচ্ছে ৫ কোটি টাকারও বেশি।

এবার চলুন চলচ্চিত্রের বাজারে। দেখা যাচ্ছে এখানেও সঞ্চয়িতার কমিশনার সাহেব হিমসিম খাচ্ছেন। কারণ কালোটাকার এই বাজারে তাঁর মতন একজন সজ্জন ব্যক্তি কি করে পেরে উঠবেন। বাজেয়াপ্তের তালিকায় আছে নতুন কয়েকটি চলচ্চিত্র এবং দুটি চলচ্চিত্র প্রডিউসার্স ও ডিস্ট্রিবিউটার্স সংস্থা। কলকাতার লালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স এবং বোম্বাইএর দি সান লাইট ফিল্ম প্রডিউসার্স অন্যতম। জানা গেল এই দুয়েরই মালিক হচ্ছেন সঞ্চয়িতার অন্যতম সেরা প্রমোটার তপন গুহ। এ পর্যন্ত যত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার মোটা অংশ ছিল স্বনামে বেনামে ঐ তপন গুহের। দেবেদার, আতংক, মাধুরী চলচ্চিত্রের প্রযোজকও তপন গুহ। এর মধ্যে প্রথমটির কাজ শেষ হয়েছে অনেকদিন আগেই কিন্তু রিলিজ করা হয়নি কোন এক অজ্ঞাত কারণে। তবে রিলিজ না হলেও পরিবেশকের কাজ থেকে আগাম টাকা নিতে উনি ভুল করেন নি। বাকি দুটি ছবির কাজ অসমাপ্ত। আঁচল ছবি আগেই বেরিয়ে গেছে, নসিব এখনও মুক্তি পায় নি। বাজেয়াপ্ত করাবার পর কমিশনার এখন সমাপ্ত ছবিগুলি নতুন পরিবেশকদের কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রির চেষ্টা করছেন। অপরদিকে অসমাপ্ত ছবিগুলির ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রযোজক চেষ্টা চলছে। কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে। তবে বাধাও আসছে অনেক। এর মধ্যে মজার ব্যাপার হচ্ছে এইসব ছবির নায়ক–নায়িকারা তাঁদের চুক্তির টাকা দাবি করছেন সঞ্চয়িতার কমিশনারের কাছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে দাবি করতে পারেন যাঁরা তাদের মধ্যে আছেন মৌসুমী চ্যাটার্জি। উনি দাবি করছেন দাবেদার ছবির জন্য ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। কারণ ওঁর সংগে নাকি চুক্তি ছিল ১৯৮১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে ৮৫০০ টাকা দেবার। এই ছবির প্রচারের জন্য ৪ হাজার টাকার দাবি করেছেন কলিন পাল। আবার ছবি রিলিজ হবার আগেই দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের পরিবেশকের কাছ থেকে তপন গুহ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নিয়েছেন বলেও ঐ পরিবেশক কমিশনারের কাছে দাবি করেছেন। রাকেশ রোশন 'মাধুরী' (হিন্দি ও বাংলা) ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার দাবি করেছেন। এছাড়া আঁচল ছবির পরিবেশনার জন্য এন. এন. সিপ্পী দাবি করেছেন ১ লাখ ৩০ হাজার ১ শত ৫৪ টাকা। এই ধরণের উৎপাত কমিশনারকে আগেও সামলাতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজেয়াপ্ত করবার আগে সিনেমা হলের মালিক তপনগুহের কাছ থেকে প্রমোদকর আদায় করতেন না। এখন তা আদায় করছেন কমিশনারের কাছ থেকে।

মজার ব্যাপার বাজেয়াপ্তের ধাক্কায় ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তিরা কমিশনারের কাছে অন্যান্য বিষয় গোপন করেও স্বেচ্ছায় সঞ্চয়িতা থেকে ঋণ এবং ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার কথা স্বীকার করেছেন। মাসিক ভাড়া ও ঋণের টাকা কিস্তিতে শোধ করতে শুরু করেছেন। ঋণ শোধকারীদের মধ্যে অন্যতম হলেন কেডিয়া ও মোরারকা গ্রুপ। মাসিক ভাড়া দিচ্ছেন যাঁরা তাদের মধ্যে অন্যতম ডিনার্সক্লাব, কিরলোর্স্কার, মোদী হেরক্স, এডভারটাইজিং কনস্যালটেন্ট প্রভৃতি। এছাড়া জিয়াগঞ্জর বাজেয়াপ্ত লালী বিস্কুট কোম্পানীর বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি দপ্তর কমিশনারের কাছে মাসিক ভাড়া জমাদিতে শুরু করেছেন। তবে লালী, শেলী সিনেমা হল এবং ক্যানিং–এ মোটর লঞ্চ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে চললেও এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য লাভ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে পাতিপুকুর টাউন শিপে ৪ কাটার কিছু বেশি জমি ৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। ক্রেতা হলেন দুবাইয়ের এক বাঙালী ভদ্রলোক। দমদম পার্কের কাছে ২০ কাঠা জমি বিক্রির জন্য নিলাম ডাকা হয়েছে। তারকেশ্বরেও কয়েক বিঘা জমির সন্ধান পাওয়া গেছে।

কমিশনার দত্ত মনে করেন বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ছাড়াও সারা ভারতে আরও অনেক সঞ্চয়িতার বেনামি সম্পত্তি আছে। যার খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর মতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির আইনগত ফয়সালা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে না। কারণ তাঁর প্রতিপক্ষ বেশ শক্তিশালী। খ্যাতনামা আইনজীবিরা তাঁদের হয়ে লড়ছেন। সে তুলনায় কমিশন বেশ দুর্বল। তাই কমিশনার তাঁকে সাহায্য করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদন করলে কলকাতা

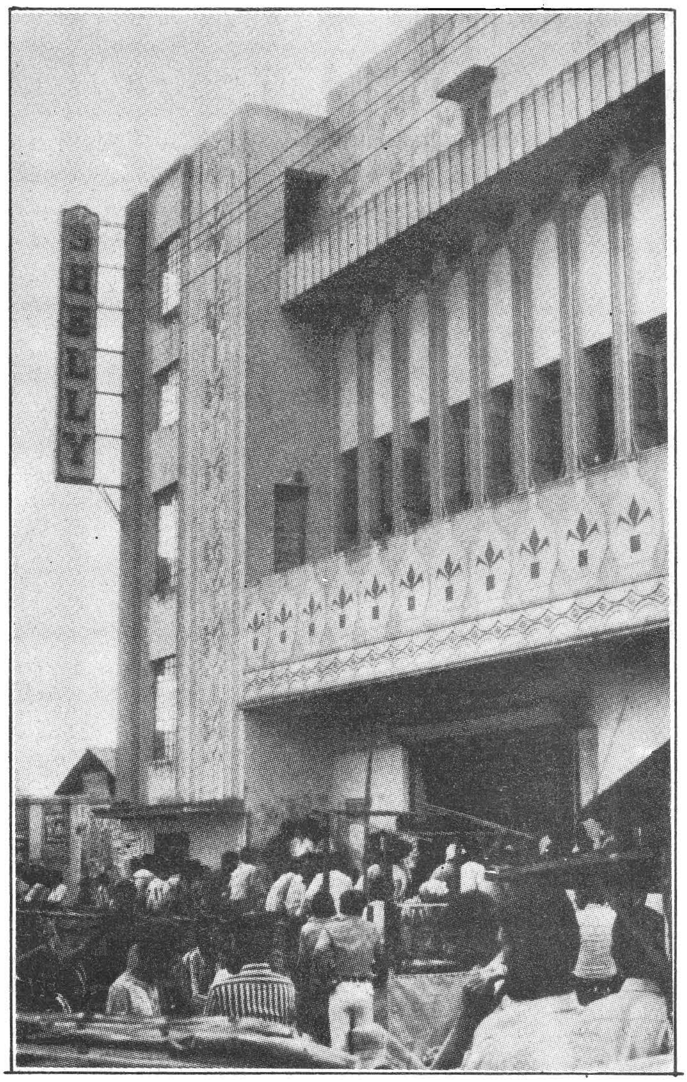

সঞ্চয়িতার অংশীদার তপন গুহুর দমদম্ পার্কের কাছে
শেলী সিনেমা হল

হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোনো বিচারপতি এবং কর্মরত একজন প্রবীণ এ্যাডভোকেটকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠনের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাছাড়া ঐ আদেশে সুপ্রীমকোর্ট কমিশনারকে নতুন ক্ষমতা দিয়ে বলেছেন, সঞ্চয়িতার মোট ঋণের পরিমাণ নিধারণ ও তা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে কমিশনার যে আদেশ দেবেন তা আদালতের নির্দেশ হিসেবে গণ্য হবে। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে একমাত্র কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চেই আপিল করা যাবে। এই নতুন আদেশ অবশ্যই সঞ্চয়িতার কমিশনারের কাজকে তড়ান্বিত করবে এবং মামলা গুলির দ্রুত ফয়সালা সম্ভব হবে। কমিশনার দত্ত মনে করেন উপদেষ্টা বোর্ড তাঁকে প্রভূত সাহায্য করবে।

কমিশনার দত্ত তাঁর কার্যকালের হিসাব দিতে গিয়ে জানালেন সব ঠিকমত চললে টাকা ফেরত দেওয়া যাবেই। ছোট আমানতকারীদের হতাশ হবার কোন কারণই নেই। তাঁর আশা আগামী বছরের মধ্যেই একটা উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠবে।

এই আশাব্যঞ্জক চিত্রকে আরও উজ্জ্বল করা যেত যদি সঞ্চয়িতার পালের গোদারা সকলেই ধরা পড়তেন। মূল হোতা শম্ভু মুখার্জি মৃত। অন্যমতে তার মৃত্যুও রহস্যজনক। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কমিশনের সামনে তাঁর সম্পত্তির যে খবর আছে তা খুবই নগন্য। অথচ প্রচার ছিল সবকিছুর জন্য সেই দায়ি। তাঁকে সামনে রেখে যাঁরা সর্বস্ব আত্মসাৎ করেছিলেন সেই স্বপন গুহ, বিহারীলাল মুরারকা, প্রশান্ত ব্যানার্জি, বিজয় মুখার্জি খবর কি? কমিশনার দত্ত এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। এদের বেনামি সম্পত্তির খবরও কমিশনের কাছে খুবই অল্প। ব্যতিক্রম তপন গুহ। কি করেই বা এঁরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা সত্যিই রহস্য জনক। এই রহস্যের কিনারা যত শীঘ্র হবে ততই আমানতকারীদের পক্ষে মঙ্গল। এদের বেনামি সম্পত্তির উদ্ধার করার অর্থই হল আমানতকারীদের টাকা ফেরত পাবার নিশ্চয়তা। □

কিছু তথ্য

(১) বাজেয়াপ্ত কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশী তল্লাসি শুরু হবার আগে অর্থাৎ ১৯৮০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টসের কাছে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৩,৫১,২৩,৫০০ টাকা। কিন্তু পুলিশি অভিযানের সময় বা পরে ঐ টাকার আর হদিস পাওয়া যায় নি।

(২) শম্ভুপ্রসাদ মুখার্জীর গৃহ তল্লাসি করে সিন্ডিকেট ব্যাংকের (গড়িয়াহাট শাখা) যে পাশ বই পাওয়া গিয়েছে তাতে বেনামী লেনদেনের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে।

APCAR AVE TOON নামে ঐ শাখায় একটি কারেন্ট Account (No. 210) খোলা হয় নগদ ২৮ লাখ টাকা দিয়ে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নগদে ৫০ থেকে ৮০ লাখ টাকা করে জমা দেওয়া হয়। মোট জমার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৮ কোটি টাকা। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯৮০ সালের ১১ নভেম্বর থেকে ঐ জমা টাকা তোলা হতে থাকে এবং সব টাকাই তোলা হয় ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে। ঠিক তার সাত দিন পরই অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর সঞ্চয়িতার অফিসে তল্লাসি করা হয় এবং রাজ্য সরকার এফ. আই. আর. করেন। ঘটনাটি কি ইঙ্গিত বহন করে?

(৩) বাজেয়াপ্ত বাসনপত্র থেকে হিসেব করে দেখা গেছে ১০ হাজার বা তার কম টাকার আমানতের পরিমাণ হবে প্রায় ১১,৪৯,৪০,৯৫০ টাকা।

শম্ভু মুখার্জির শেষ চিঠি

সঞ্চয়িতার প্রতিষ্ঠাতা–কর্ণধার শম্ভু মুখার্জি মৃত্যুর পূর্বে বোম্বে থেকে সঞ্চয়িতার এজেন্টদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সম্ভবত তাঁর শেষ চিঠি। চিঠিটি আমরা পেয়েছি পুলিশ সূত্রে। এই চিঠিতে কিছু ব্যক্তিগত কৈফিয়তের সংগে বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে রকমারি অভিযোগ আছে। এই অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করা কঠিন কারণ যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদের হদিশ পাওয়াই সমস্যা, পাওয়া গেলেও কেউ মুখ খুলতে চান না। শম্ভুবাবুর শেষ চিঠিটি পড়ে অভিযুক্তদের কেউ যদি কিছু জানাতে চান, আমরা প্রকাশের কথা বিবেচনা করব। আমরাও চাই সত্য উদ্ঘাটিত হোক। বাংলায় টাইপ করা চিঠিটির সবটা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই কিছু শব্দ বাদ রাখতে হয়েছে।

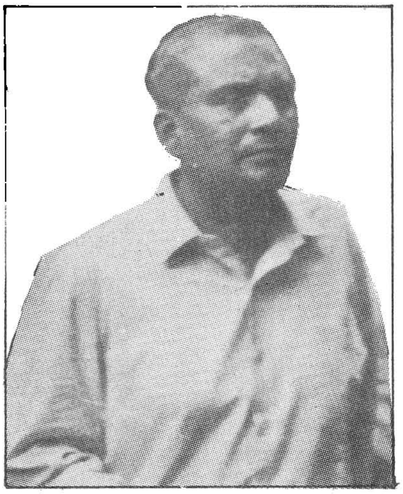

From : Sri Sambhu Prasad Mukherjee
Partner Sanchita Investment,
5 & 6 Fancy Lane.
Calcutta-1

To
The Agent
Sanchaita Investment
5 & 6 Fancy Lane
Calcutta- 1.

Hotel Oberoi Towers
NARIMAN POINT
Bombay-400021
INDIA

Telephone. 234343
Telex 41523/4154

মাননীয় মহাশয়গণ,

আমার আজকের বিবৃতি আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছবে কিনা তা জানি নাঃ তবে এই হয়তো আমার জীবনের শেষ বিবৃতি, প্রয়োজন হলে আপনারা আমার এই চিঠি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেখিয়ে বাকি কার্য উদ্ধার করতে পারবেন। কারণ আমাদের ব্যবসায়ে মূলধন ছিল বিশ্বাসঃ সেই বিশ্বাস যদি আমাদের ২/৪ জন বড় এজেন্ট তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সরকারের সংগে হাত মিলিয়ে মামলা নষ্ট করবার চেষ্টা করে তা হলে সেই ব্যবসা দাঁড়াতে পারে কি? যাঁরা এটা করেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, আজ, এতদিন পরে আমি আমার ব্যক্তিগত/পারিবারিক জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে আপনাদের কাছে এই খোলা চিঠি লিখছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন মানুষ চরিত্র এবং স্বার্থের জন্য মানুষের কি না করতে পারে। আমাদের ব্যবসার তিনজন অংশীদারঃ আমি, বিহারীবাবু ও স্বপন গুহ। ব্যবসার লাভ লোকসান তিনজনেরই সমান। এক্ষেত্রে আমাকেই বা কেন আমার পরিবার ও সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমার ভাগ্নে রজত চক্রবর্তীও একজন এজেন্ট। আমি ও আমার মা আমার ভগ্নীপতি মারা যাবার পর থেকেই শিয়ালদার বাড়ি ছেড়ে তালতলায় এসে উঠি। তখন সঞ্চয়িতার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কই আর তো কোন এজেন্টের বাড়িতে তালতলার বাড়ির মতন কোন হাংগামা হচ্ছে না, কোন অংশীদারের বাড়িতে তো কোন হাংগামা হচ্ছে না। যাঁরা রজত চক্রবর্তীর থেকেও অনেক বড় এজেন্ট (তাঁদের মধ্যে স্বপন গুহও আছেন) সেখানে তো কোন হাংগামা হচ্ছে না। তবে কেন একমাত্র কেন্দ্রস্থল তালতলা। আজকে পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংক থেকে চেক ফেরৎ আসছে কারণ কি? কারণ একটাই, যে আমি বিশ্বাস করে স্বপন গুহর হাতে খোলা চেক বই দিয়েছিলাম। আজই আমি নিজে হাতে চেক অফিস থেকে সুনীলবাবু মারফৎ দিয়েছি, তার আগেই স্বপন গুহ ব্যাংক ম্যানেজারের সংগে হাত মিলিয়ে নিজের চেকগুলি ক্যাশ করিয়ে নিয়েছেন। টাকার জোগাড় করব আমি আর ফল খাবে অন্যে এটা চিরকাল চলতে পারে না। মাননীয় এজেন্টরা চেয়েছিলেন যে তাঁরা যে টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তা কোথায় এবং কি ভাবে দেওয়া হচ্ছে তা জানবার জন্য। আমি যে তালিকা তাদের দিয়েছি তার মধ্যে তাঁরা কত টাকা আজ পর্যন্ত আদায় করছেন? অবশ্য আমি শুধু চেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার হিসাবই তাদের দিয়েছি। আমার মাননীয় এজেন্টগণকে দেনাদারেরা বলছেন যে অনেক টাকা নাকি এনট্রির হিসাব আছে। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যাঁরা এই কথা বলছেন তাঁদের নিকট সঞ্চয়িতার লেটার প্যাডে আমার সহি করা কাগজ থাকবে। যাকে পেটি লোন বলা হয়। এবং যদি তাঁরা সেটি দেখাতে পেরে থাকেন সত্যিই এনট্রি হিসাবে আমি মানতে তা রাজী।

এইবার আমি একে একে আমার সমস্ত বিশিষ্ট এজেন্টদের কথায় আসছিঃ

১। তপনকুমার গুহর দেনা আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় ১১ কোটি টাকা। এছাড়া ডিসেম্বরে ১৯৮০ থেকে আজ পর্যন্ত আরও প্রায় ২০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। সুদ ১৮% মিলিয়ে মোট পাওনা দাঁড়াবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা। এই ভদ্রলোক আমাকে বহুদিন ধরে অনুরোধ করে আসছেন যেন আমি কারও কাছে এই ধার সম্পর্কে কিছু না বলি। এর প্রতিটি টাকা চেকে দেওয়া আছে এবং প্রতিটি সম্পত্তি আমাদের কোম্পানীর কাছে বন্ধক আছে দেখেই এর টাকা আদায় করতে বিশেষ সময় লাগবে না। কারণ উনি সব সময়েই বলে এসেছেন যে আমি ১৯৮২ সালের জুন মাসের মধ্যে অন্তত পাঁচ কোটি টাকা ফেরত দেবো। কিন্তু ফেরত দেওয়া তো দুরের কথা উনি সব সময়েই যখন কলকাতায় থাকেন ৫/১০ হাজার টাকা রোজই আমার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর বক্তব্য যে উনি কোম্পানীকে ৭০ কোটি টাকার ব্যবসা দিয়েছেন—কাজেই ওর টাকাটা কেটে নিয়ে অর্থাৎ ১৭ কোটি টাকার বাকিটা ওকে ফেরৎ দেওয়া হোক। কিন্তু উনি যে সমস্ত এজেন্টদের এনেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই তো সঞ্চয়িতার রসিদ আছে কাজেই তাঁরা কী কোম্পানীর মালিকদের ছেড়ে দেবে? তপন বাবুর নিজস্ব ব্যবসা তো পাঁচ কোটি টাকা। বাকি টাকাতো অন্যান্য এজেন্টদের যাঁরা ওর মারফত এসেছেন। কিন্তু তপনবাবু নিজেও তো শ্রীমতী জ্যোতিকণা মুখার্জী (দীপক মুখার্জী রা) মারকভ আমাদের প্রতিষ্ঠানে

এসেছিলেন। আজ তপনবাবু কি ওঁর মাকে চেনেন? ঠিক তেমনই অন্যান্য এজেন্টরা কি তপনবাবু যা বলবেন মেনে নেবেন? অন্যান্য এজেন্টরা যা কমিশন পেয়েছেন তপনবাবু তার আয় থেকে ২৫ পয়সা বেশি পেয়েছেন। অর্থাৎ যেহেতু উনি অন্যান্য এজেন্টদের এনেছেন। কাজেই তাঁদের পয়া টাকার উপর ২৫ পয়সা রয়েলটি হিসাবে নিয়েছেন। যখন যে কোন মানুষ রয়েলটি নেয় তখন তার অন্যান্য কর্তব্যগুলোও থাকে। কর্তব্যবোধ তো দূরের কথা সামান্য মনুষ্যত্ববোধও ওর নেই। না হলে যবে থেকে মামলা শুরু হয় অন্তত আমি হাজার বার বলেছি যে তপন নগদ টাকা কিছু অন্তত দাও। আমরা যখন মামলা করছি উনি তখন বোম্বেতে দুটি বইয়ের সুটিং এক সঙ্গে করছেন আর মুখে বলছেন আমার কাছে ৫ হাজার টাকাও নেই। মাননীয় এজেন্টগণ, আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন সব আমার কথা। যে সময়ে মামলা চলছিল সত্য কি না। এইবার প্রশ্ন আসবে যে ওর কমিশনের টাকাটা কি হল। মানুষের টাকা গেলে একদিন না একদিন ফেরৎ আসবেই। কিন্তু চরিত্র গেলে জীবনেও তা ফেরৎ আসে না। আজ আলপনা গোস্বামীর নামে ব্যাঙ্কে ১৭ লাখ টাকা ফিকসড ডিপোজিট, কলিকাতা ও বোম্বেতে তিনটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। ১৯৮০ সালের ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত..... খরচ ছিল প্রায় ..... আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে যখন গন্ডগোল হয় তখন আমরা ৩১/২% হারে এজেন্টদের পেমেন্ট করি। কিন্তু সেই সময়েও তপনবাবু পুরো টাকা নিয়ে গেছেন। আমার অজ্ঞাতসারে তার ভগ্নিপতি তড়িৎবাবু মারফত। যার জন্য আজ পর্যন্ত কোম্পানিতে আমার পাওনা ৩৮ লাখ। তখন তপনবাবু একটি নতুন সুর ধরেছেন যে তার যা টাকা দেনা আছে তা নাকি সবটাই এনট্রি এবং তাকে মদত যোগাচ্ছেন আমাদেরই সলিসিটর দীনবন্ধু। টাকায়ই সব হয়। মানুষ কিনছে বিশেষত: দীনু মন্ডলের মত লোককে কিনতে ৫/৭ লাখ টাকাই যথেষ্ট। বেশ যদি এনট্রি হয় তো তপন বাবু আমার সই করা রশিদ দেখান। আমি মেনে নেবো যে সবটাই এনট্রি। ফেরা অ্যাকটে বাঁচবার জন্য এয়ারপোর্ট হোটেলে আমি যখন মিস্টার বিক্রম কে দেবার জন্য ওকে ৫ লাখ টাকা দিলাম সেখানে সুব্রত মুখার্জি ছিল। সেই টাকা মি: বিক্রমকে না দিয়ে সুটিংয়ে চলে গেল। পাগলেও নিজের ভাল বোঝে। এ তাও বোঝে না। ফেরা অ্যাক্ট-এ ধরবার জন্য আর ১০ দিনের মধ্যেই দিল্লির লোকেরা এগুচ্ছে, মাঝখান্ থেকে আমার নামটাও তপন গুহ এর মধ্যে জড়িয়ে দিয়েছে। আমি জীবনে কখনও নেপাল গেলাম না আর আমি নাকি ফরেন কারেনসি তছরূপ করেছি? এর থেকে দু:খের বিষয় আর কি থাকতে পারে। এইবার তপনবাবুর ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথায় আসা যাক। তাঁর অন্তত ৬ জন

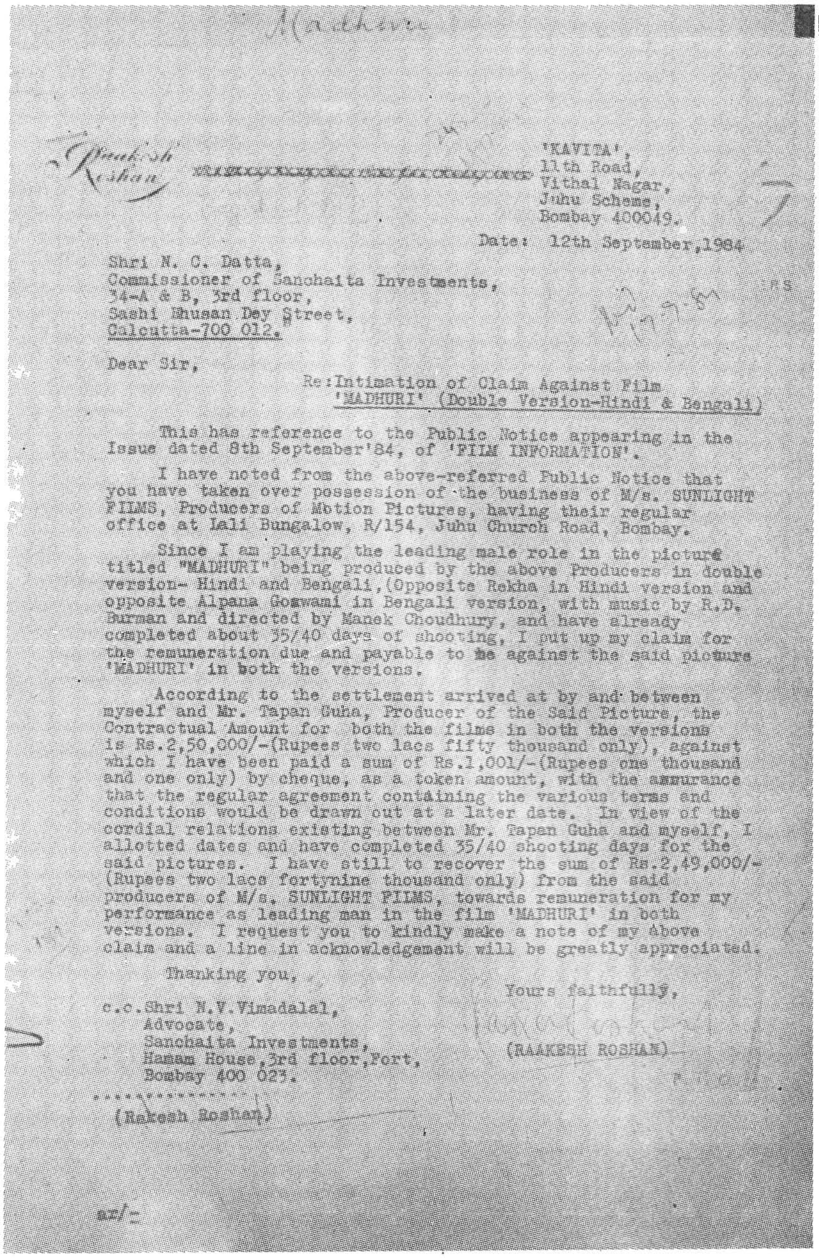

'KAVITA',
11th Road,
Vithal Nagar,
Juhu Scheme,
Bombay 400049.

Date: 12th September,1984

Shri N. C. Datta,
Commissioner of Sanchaita Investments,
34-A & B, 3rd floor,
Sashi Bhusan Dey Street,
Calcutta-700 012.

Dear Sir,

Re:Intimation of Claim Against Film
'MADHURI' (Double Version-Hindi & Bengali)

This has reference to the Public Notice appearing in the Issue dated 8th September'84, of 'FILM INFORMATION'.

I have noted from the above-referred Public Notice that you have taken over possession of the business of M/s. SUNLIGHT FILMS, Producers of Motion Pictures, having their regular office at Lali Bungalow, R/154, Juhu Church Road, Bombay.

Since I am playing the leading male role in the picture titled "MADHURI" being produced by the above Producers in double version- Hindi and Bengali,(Opposite Rekha in Hindi version and opposite Alpana Goswami in Bengali version, with music by R.D. Burman and directed by Manek Choudhury, and have already completed about 35/40 days of shooting, I put up my claim for the remuneration due and payable to me against the said picture 'MADHURI' in both the versions.

According to the settlement arrived at by and between myself and Mr. Tapan Guha, Producer of the Said Picture, the Contractual Amount for both the films in both the versions is Rs.2,50,000/-(Rupees two lacs fifty thousand only), against which I have been paid a sum of Rs.1,001/-(Rupees one thousand and one only) by cheque, as a token amount, with the assurance that the regular agreement containing the various terms and conditions would be drawn out at a later date. In view of the cordial relations existing between Mr. Tapan Guha and myself, I allotted dates and have completed 35/40 shooting days for the said pictures. I have still to recover the sum of Rs.2,49,000/- (Rupees two lacs fortynine thousand only) from the said producers of M/s. SUNLIGHT FILMS, towards remuneration for my performance as leading man in the film 'MADHURI' in both versions. I request you to kindly make a note of my above claim and a line in acknowledgement will be greatly appreciated.

Thanking you,

Yours faithfully,

(RAAKESH ROSHAN)

c.c.Shri N.V.Vimadalal,
Advocate,
Sanchaita Investments,
Hamam House,3rd floor,Fort,
Bombay 400 023.

....
(Rakesh Roshan)

sz/-

মাধুরী ছবি সম্পর্কে এম সি দত্তকে লেখা রাকেশ রোশনের চিঠি।

মক্ষিকা আছে। এবং তাদের টাকার ও সম্পত্তির পরিমাণ আলপনা গোস্বামীর থেকেও কোন অংশে কম নয়। তিনি যে টাকা মাসে কমিশন হিসাবে পেতেন তার সবটা কোথায় যেত তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য তিনি নিজের পরিবারের জন্য প্রায় ২০ লাখ টাকার মতো অলঙ্কারাদি করিয়ে দিয়েছেন। এখন মাননীয় এজেন্টগণ আপনারাই বলুন, যে ব্যক্তি আপনাদের টাকার রয়েলটি নিয়ে নিজে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন, আপনারা কি তাঁর কাছ থেকে ১৭ কোটি টাকা উদ্ধার করবেন না? আর ওঁর আর একটি কথা, উনি আপনাদের প্রত্যেককে ডাসটবিন থেকে তুলে এনেছেন। আপনারাও নিশ্চয় কেউ কেউ একথা শুনে থাকবেন। আমি যদি ইহ জগতে নাও থাকি তবুও আমার একান্ত অনুরোধ যে আপনাদের টাকা আপনারা উদ্ধার করুন। আর কিছু ওর সম্পর্কে বলবার নেই। কারণ উনি প্রকাশ্যে আমার মা ও দিদির সম্বন্ধে কটূক্তি করছেন।

২। শ্রীপ্রশান্ত ব্যানার্জিকে আমি সত্যিই আমার ভাগ্নেদের থেকেও বেশি বিশ্বাস করতাম ও ভালবাসতাম। আমার প্রত্যেকটি ক্যাশ টাকার হিসাব ওর কাছেই থাকতো। যেখানে যেখানে টাকা লগ্নী করা হতো তার সব রসিদও ওর কাছে থাকতো। কিন্তু সেই চরম পরিহাস। বিশ্বাস ঘাতকতা। তিনটি সম্পত্তি যার আনুমানিক মূল্য ৫০ লাখ ওর নামে কিনিয়ে ছিলাম। যার মধ্যে দুটো সম্পত্তি ও বিক্রি করে দিয়েছে। আমাকে এক পয়সাও দেয় নি। আর অশোকা ফ্ল্যাট বড় মনের মতো করছিলাম মায়ের গুরুর

জন্য। ও এখন সেটাও দিতে চাইছে না। জোর করে ওর সমস্ত পরিবারের বিরুদ্ধে একা লড়ে ওর সঙেগ গীতার বিয়ে দেওয়ায় হয়ত এই আমার প্রাপ্য। প্রশান্ত হয়তো বলবে যে ঠিক আছে আমার যে ------আছে তার থেকে ৫০ লাখ টাকা কেটে নেবেন। কিন্তু তার পার্টিরা যখন আমার বাড়িতে সঞ্চয়িতার রসিদ নিয়ে আসবে তখন তাদের কি জবাব দেব? প্রশান্তকে দু-বার অ্যারেস্ট করা হলে কেন? যাতে আমাদের ব্যবসার যত কোটি টাকার রসিদ, দেনদার ওর কাছে আছে জানবার জন্য এবং ভয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ও বলে এসেছে যে টাকা আমরা লগ্নি করেছি তার প্রায় ৮০ কোটি টাকার রসিদ ওর কাছে আছে। যেদিন শেষ অ্যারেস্ট হয় সেই দিন ওর কাছে ৪৫ লাখ টাকার রসিদ ছিল। সেটা পুলিশ কেড়ে নিয়েছে। আমার কাছে কাকে কি টাকা দেওয়া হয়েছে নগদে তার হিসাব আছে, কিন্তু সাপোর্টিং ডকুমেন্ট ঐ ৮০ কোটি টাকার সম্পূর্ণ ওর কাছে আছে। প্রশান্ত ব্যানার্জি যদি ঐ সমস্ত কাগজ ফেরৎ দেয় তা হলে কোম্পানি ১/২ বছরের মধ্যে প্রত্যেকের টাকা ফেরৎ দিতে পারবে। যদি অস্বীকার করে মাননীয় এজেন্টগণ আপনাদেরই তা উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাকে খুন করার নানা রকম চক্রান্ত চলছে। যদি আমি নাও থাকি তাহলেও আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ যেন এই টাকা উদ্ধার হয়।

৩। শ্রীসুব্রত মুখার্জি: তপন গুহ যদি সুব্রতর কথা শুনে চলত তা হলে আর বর্তমান দুরবস্থা হত না। কিন্তু সুব্রত এত বড় বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে কি করে যে ফেরা অ্যাকট নিজেকে জড়াল আমার তা বুদ্ধির বাইরে। দীনু মন্ডল বা ভরদ্বাজের বাপের ক্ষমতা নেই যে ১৫ দিনের মধ্যে এদের জেলের বাইরে রাখে। সুব্রতর সঙেগ আমার ব্যক্তিগত কোন বিরোধ নেই। তবে চামচাগিরি আমি জীবনে কখনও পছন্দ করি না এবং আজ পর্যন্ত আমার জীবনে কোন চামচা জোটে নি।

৪। শ্রীরামদুলাল ব্যানার্জি: বাপের ব্যাটা। স্পষ্ট বক্তা। জীবনে অন্যায় করে না।

৫। শ্রীবিনয় মুখার্জি:-কথায় আছে সূচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়। আমার জীবনে সত্যকার শনি। আমার কাছে টাকা ধার নিয়ে আমাকে তার মধ্যে ২ লাখ টাকা ফেরত দিয়ে পুলিসের রুণু নিয়োগীর কাছে খবর দেয় যে আমি ২ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়েছি। পাপ আর পারা কোনদিন চাপা থাকে না। একদিন না একদিন তা আত্মপ্রকাশ করবেই। যেদিন থেকে ৯৭ লাখ টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না সেদিন থেকেই ও যাতে আমি ওটা না ফেরত চাই তার হিসাব করে যাচ্ছে। এবং হয়ত আমাকে দিয়ে কোন কাগজে সইও করিয়ে নিয়েছে। আমার অন্তরের সুযোগ নিয়ে।

আলপনা গোস্বামী

মাননীয় এজেন্টগণ এই ভদ্রলোকের কোন ক্ষমা নেই আপনাদের কাছে।

৬। আমার অন্যান্য এজেন্টগণ:- প্রত্যেকেই প্রায় ভদ্রলোক; কারো সম্বন্ধে কোন অভিযোগ নেই। কেবল যে তিনজনের কথা লিখেছি তাদের কাছ হতে কি ভাবে সব টাকা আদায় করা যায় এ দায়িত্ব আপনাদের।

৭। আমার নিজের কথা:- মানুষের স্বভাব একে অন্যকে বিশ্বাস করা। আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন। অবশ্য তপনবাবু বলেন তাকে বিশ্বাস করেন। কোটি কোটি টাকা এনে দিয়েছে; এবং সেই টাকা ফেরৎ দেওয়া আমাদের কর্তব্য কিন্তু আপনারা এটাও নিশ্চয়ই বুঝিতে পারছেন যে টাকাটা একদিনে বা এক বছরে জমা হয় না। বছরের পর বছর মিলিয়ে আজ ৯০ কোটি বা কিছু বেশি জমা পড়েছে। কাজেই আমার মাননীয় এজেন্ট মহাশয়গণ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রী তপন গুহ শ্রী প্রশান্ত ব্যানার্জি এবং শ্রী বিনয় মুখার্জির উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারেন এবং আমার মনে হয় শ্রী মানব দত্ত অথবা মি: এস. এন. মিত্র অথবা আপনাদের মধ্যে যাকে আপনারা উচিত বিচার করেন তাঁরই নেতৃত্বে এগিয়ে চলুন। যে সমস্ত পার্টি টাকা ফেরৎ দিচ্ছে না হাজার লোক নিয়ে সেখানে ঝামেলা করুন। দেখুন টাকা আদায় হয় কিনা। কেবল আমার একার উপর চাপ সৃষ্টি করলেই কি টাকা আদায় হবে? আপনাদের মধ্যে কেউ আমার অবস্থায় পড়লে কি করতেন? হ্যাঁ, কোম্পানি থেকে আমি প্রায় ১০ লাখ টাকা নিয়েছি। ৩ বছর আগে আমার একটি কারখানার জন্য। আমি এই মুহূর্তে জানাচ্ছি যে আপনাদের মধ্যে যে কেউ ওটা নিয়ে নিন, আমার কোন প্রয়োজন নেই। আর আপনারা তো অনেকেই অনেক কিছু করেছেন, আমার কোন নারী ঘটিত ব্যাপার নেই বা কোন বাড়াবাড়ি কিছুই নেই। বা কিছু সম্পত্তি কোম্পানি ও আপনাদের সঞ্চয়িতা ছাড়াও আমার অন্য কোম্পানিগুলি থেকে যার বাৎসরিক রেমুনারেশন পাই তাতে আমার মতন লোকের একলার পক্ষে যথেষ্ট। আর আমাকে আমার দিদির সংসারে সাহায্য করতে হয় না। কারণ আমার অবর্তমানে ভগ্নিপতি এখনও কলকাতা শহরে ৫ খানা বাড়ি করে গিয়েছেন। পুজো আর্চা, দোল, দুর্গোৎসব সব কিছুই সেই পয়সাতেই অর্থাৎ বাড়ি ভাড়ার পয়সাতেই হয়। সঞ্চয়িতার পয়সায় আমাদের কোন সম্পত্তিই কেনা নেই। কাজেই নতুন করে ব্যবসা করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। দেনদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে পাওনাদারদের মিটিয়ে দিন, এই আপনাদের কাছে একমাত্র ভিক্ষা ও কামনা। আজ আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেন? আমার জীবনের ওপর পর পর দুবার চান্স নেওয়া হয়েছে, শুধু একবার বাকি আছে। আর আপনাদের এত সমস্ত ভিতরের কথা জানাতে পারতাম না। শুধু দু:খ রয়ে গেল যে আমার পরিবারের কারও সঙেগ শেষ দেখা হলো না। আপনারাই এর বিচার করবেন। তপনের কাছ থেকে যদি টাকা আদায় করতে হয় তো সময় খুব কম জানবেন। কলকাতায় আমি এখন ঘুরতে পারছি না। প্রাণের ভয় ছাড়াও অন্য ভয় হচ্ছে। আপনাদের টাকা আপনারা ফেরৎ পেলেন কিনা সেটা দেখা।

আমার জীবনে এই প্রথম যে আমি আমার সমস্ত পরিবারকে ছেড়ে প্রায় ২০ দিন বাইরে আছি। কিন্তু উপায় কি! ভবিতব্য! আর একটা ব্যাপার জানিয়ে আমি আমার সমস্ত বক্তব্য শেষ করবো। যে আদায়কারী কমিটি তৈরী হয়েছিল তারা কি এখনও ঠিকমত কাজ করছে? না সব দেনাদারী এনট্রি বলে ফেরৎ দিচ্ছে? যদি তা হয় তাহলে আপনারা আবার নতুন করে কমিটি তৈরি করুন। টাকা না দিলে হাঙগামা করুন। মোট কথা আপনারা যেটা ভাল মনে করবেন তাই করবেন। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু চাই যে প্রতিটি পাওনাদার যাদের অন্তত ১০ হাজারের মত টাকা আছে তারা যেন আগে ফেরত পান। আমার অফিসের লোকেদের পূর্ণ সহযোগিতা আপনারা সব সময় পাবেন। আপনারা দয়া করে আমার বাড়ির প্রতি একটু নজর রাখবেন। কারণ আমি চলে আসার পর থেকে বাজার বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ির কোন লোককে বার হতে দিচ্ছে না পাড়ার ছেলেরা। এককথায় সকলে গৃহবন্দী। এর কারণও তপনবাবু। উনি আমাদের পাড়ার ছেলেদের মধ্যে যে লীডার তাদের বলে এসেছিলেন ১০ জুন তিন কোটি টাকা তিনি নিজে ফেরত দিয়ে দেবেন।

কাজেই এখন তারা সেই সুযোগে বলে বেড়াচ্ছে যে তপনবাবু নিশ্চয়ই টাকা দিয়েছেন। রজতবাবু ও তার পরিবারের লোকেরা তা দিচ্ছে না। এ কি রকম পরিহাস।

আপনাদের সব কিছু জানালাম। আমাকে আপনারা হয়তো ক্ষমা নাও করতে পারেন। আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। আর হ্যাঁ দীনু মন্ডল বলে আমাদের কোন সলিসিটার নেই। কাজেই যদি কোন সলিসিটার দরকার হয় তাহলে মি: আর এল গগিগর–এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের মামলার জন্য ..... কে ৯০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। ৭৬০০০ টাকার একটি ছোট বিল বাকী ছিল। আমি যখন এখানে চলে আসি।' আমার দিদিকে ধমকে ৩৫ হাজার টাকা নিয়েছে। দিদি তার গয়না বিক্রি করে ঐদিন ঐ টাকা দেন। আপনারাই বলুন ঐ লোকের সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কোন সম্পর্ক রাখা যায়? আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি

সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টস

অংশীদার, প্রোমোটার ও কয়েকজন প্রধান এজেন্টদের নামের একটি তালিকা

অংশীদার

(১) শম্ভু প্রসাদ মুখার্জী (প্রয়াত)

(২) বিহারীলাল মুরারকা

(৩) স্বপন কুমার গুহ

প্রমোটার

(১) তপন কুমার গুহ

(২) গোপাল লাল কেডিয়া।

প্রধান এজেন্টগণ

(১ [illegible] চক্রবর্তী, (২) কল্যাণ চক্রবর্তী, (৩) সুকুমার ভট্টাচার্য, (৪) স্বপন রায়, (৫) সুব্রত মুখার্জী, (৬) সৌমেন্দ্র নাথ মিত্র, (৭) শ্যামল গাঙ্গুলী, (৮) বিজয় ব্যানার্জী, (৯) প্রশান্ত ব্যানার্জী, (১০) বিজয় মুখার্জী, (১১) রজত মুখার্জী, (১২) তড়িৎ ঘোষ, (১৩) দিলীপ ব্যানার্জী, (১৪) রমেন রায়, (১৫) অমিতাভ মুখার্জী, (১৬) তরুণ গুহ, (১৭) মৃণাল কান্তি বিশ্বাস, (১৮) অশোক সাধুখাঁ, (১৯) মৃনাল মুখার্জী, (২০) শংকর পালচৌধুরী, (২১) দেবিকা বসু, (২২) চিন্ময় সরকার, (২৩) সুকেশ দাস, (২৪) প্রেমনাথ উপাধ্যায়, (২৫) চিত্ত ভট্টাচার্য এবং আরও ৫৫ জন।

এজেন্টদের তালিকা পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে ২০/২৫টি পরিবারের মধ্যেই এই ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিল।

এক নজরে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত তালিকা

কলকাতা, বোম্বাই, নয়া দিল্লি, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, লাখনউ, এলাহাবাদ, জামশেদপুর ও শিলং শহরে যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাড়ি, ফ্ল্যাট, জমি, ব্যবসার শেয়ার, গাড়ি, সিনেমাহল, সিনেমা পরিবেশক ও প্রযোজক সংস্থা।

ফ্ল্যাট-কলকাতা৹

৮নং ক্যামাক স্ট্রীট 'শান্তিনিকেতন' (৬ ও ২০ তলা)

২৭/এ ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন 'জয়-জয়ন্তি' (৫ ডি ফ্ল্যাট)

১১৬, মেঘনাদ সাহা সরণি 'আনন্দম' (ফ্ল্যাট ৫ এফ, ও ১৩ ডি)

১১, গুরুসদয় রোড 'কসুম এ্যাপার্টমেন্ট' (ফ্ল্যাট ৯৫)

সার্দার্ন এভিনিউ 'অশোক এ্যাপার্টমেন্ট' (ফ্ল্যাট ১২এ ও বি)

১২ রাউল্যান্ড রোড 'মেঘদূত' (ফ্ল্যাট ১০ সি)

২৮/১ সেক্সপিয়ার সরণি 'গঙ্গা যমুনা' (ফ্ল্যাট ৭ ও ১০৩)

২৮/২ সেক্সপিয়ার সরণি সেন্টার পয়েন্ট (৮ তলা)

১০ নং লর্ড সিনহা রোড (ফ্ল্যাট ৫ ডি)

৪২/এ সেক্সপিয়ার সরণি (৪, ৭, ও ৮ তলার এ ও বি ফ্ল্যাট)

এছাড়া ছোট-বড় সব মিলিয়ে সল্ট লেক, লেক টাউন ও অন্যান্য অঞ্চলে আর ৩০টি ফ্ল্যাট।

বোম্বাই

ফ্ল্যাট ২০৩ 'সাগর সম্রাট' – যুহুতারা রোড বোম্বাই – ৪৯

ফ্ল্যাট জি – ৩ 'কুইনস ভিউ' যুহুতারা রোড বোম্বাই – ৪৯

ফ্ল্যাট এ – ৩ 'কুইন্স ভিউ' যুহুতারা রোড বোম্বাই – ৪৯

তিনটি ফ্ল্যাট ঊষা কুঞ্জ যুহুতারা রোড বোম্বাই – ৪৯

ফ্ল্যাট ১০৫ 'ওসেন ভিউ রোড, আরবান পার্ক (পালি হিল)

ফ্ল্যাট ৮০২ ও ৫১৩ রাহেজা সেন্টার।

ফ্ল্যাট ২-এ 'ব্লু হেভেন' যুহুতারা রোড।

সঙ্গিতা এ্যাপার্টমেন্ট জুহু রোড।

এছাড়া আরও কয়েকটি ফ্ল্যাট বাজেয়াপ্তের তালিকায় আছে।

দিল্লি

ফ্ল্যাট বি-২ ও বি-৯, হেমকুঞ্জ হাউস, রাজেন্দ্র প্লেস।

একতলা ও একটা ফ্ল্যাট (৯১৩) হেমকুঞ্জ টাওয়ার, ৯৮ নেহেরু প্লেস।

১০৯ নম্বর রুম ৬, রাজেন্দ্র প্লেস।

জমি ও বাড়ি

বোম্বাই যুহু রোডে গোরোকু হাউস

যুহুতারা রোডে স্বপন রায়ের নামে বাড়ি

যুহুতারা রোডে স্বপন গুহের নামে বাড়ি

যুহু তারা রোডে তপন গুহের নামে একটি জমির প্লট।

যুহুতারা রোডে মঃ ওয়ালিয়ার না অফিসের জন্য জায়গা

দিল্লি

২৩ নং খান মার্কেটে মিঃ সবাওয়াজের না অফিসের জন্য জায়গা, দীপক মুখার্জীর না জমি সহ সম্পত্তি।

কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ ব্যাংকশাল কোর্টে হাজির করছে সঞ্চয়িতার অন্যতম কর্ণধার শম্ভু মুখার্জীকে (হাতে লাঠি)

রাজধানী ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের অফিস ৯৮ নেহেরু প্লেস

শিলং

শংকর ব্যানার্জীর নামে বাড়ি

জামশেদপুর

জি সরকারের নামে টিসকো কলোনীতে অফিসের জন্য জমি।

এলাহাবাদ

ডি. কে সাকসেনার নামে প্যালেস সিনেমা হলে সর্বোচ্চ তলার অফিসের জন্য।

হায়দ্রাবাদ

কে, কে, মল্লিকের নামে অফিসের জন্য নিহাম সাহেব রোডে ৪ তলা।

লাখনউ

গ্লিয়ট রোডে অফিসের জন্য জায়গা।

মাদ্রাজ

সৌমেন্দ্র মিত্রের নামে মাউন্ট রোডে অফিস বাড়ি। অশোক রাহাতের নামে সুকমি চেট্টি রোডে অফিস বাড়ি।

সৌমিত্র মিত্রের নামে বালমিকী স্ট্রীটে বাড়ি।

কলকাতা

জমি কইখালিতে ১৭ বিঘা, কৃষ্ণপুর রিফিউজি কলোনীতে ২০ কাঠা, পাতিপুকুর টাউনশীপে '৪৩ নং প্লট, দুর্গাপুর জোন-এ তে আর এ/৫৫ প্লট, ফারাক্কা, কালিদহ, দমদম পার্ক, জলাকৃষ্ণ ডাংগা, তপন গুহ, স্বপন গুহ ও তরুণ গুহ এবং তাঁদের স্ত্রীদের নামে তারকেশ্বর অঞ্চলে বিরাট কৃষি জমি।

রজত চক্রবর্তীর নামে বারাসতে জমি, প্রশান্ত ব্যানার্জীর নামে মহেশতলাতে জমি ও সম্পত্তি, চূনাবাটি (হাওড়া)-তে দেড় বিঘা জমি, ১/১বি উমানন্দ রোড (কলকাতা) ৫ কাঠা জমি ও সাউথ দমদম মিউনিসিপালিটিতে ৪৫ নং হোল্ডিং জমি।

বাড়ি

রিজেন্ট পার্কে – (প্রশান্ত ব্যানার্জীর নামে) ৫৬/১এ এলগিন রোডে – ১৫৬, ধর্মতলা স্ট্রীট, ২১৩ পার্ক স্ট্রীটে কহিনূর বিল্ডিংস, বাগুইহাটি আশ্বীন নগরে বকুল বীথি, 'গীতাঞ্জলী' ৭৮ সুন্দরীমোহন এভিনিউ। টজি চেম্বার (৩ তলা), ১৬নং ক্যামাক স্ট্রীটে (১৬ কাঠা জমি সহ তিনতলা বাড়ি), ২৪ পরগনার মহেশতলাতে কুমাড়পারা-র অর্ধসমাপ্ত একটি সিনেমা হল। বি বা দি বাগে স্টিফেন হাউসের রুম ৮৭, ঝাড়গ্রামের অনুপমা বিল্ডিংস। ১২ ডি আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি, প্রশান্ত ব্যানার্জীর নামে টালিগঞ্জে অর্ধসমাপ্ত বাড়ি, গোপাল কেডীয়ার নামে ৭ নং লর্ড সিনহা রোডে অফিসের জন্য বাড়ি, ৬ নং লায়ন্স রেঞ্জের ৩ তলা (২০০০ স্কোয়ার ফিট), ১১/বি বর্ধমান রোডে বাড়ি ও জমি। দেবনারায়ণ গাঙ্গুলীর নামে লিনডসে স্ট্রীটে অফিসবাড়ি।

গাড়ি

বাজেয়াপ্তের তালিকায় ৪৩ খানা গাড়ি আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য WMC — 4096 (ক্রাউন ডিলাক্স – ৭৩ মডেল) এয়ার

কনডিসনড টয়োটো, WMB 8986 এয়ার কনডিসনড বিশেষ ফিটিংস সহ মারসেডিস বেঞ্জ গাড়ি।

তাছাড়া আছে WME 5188 (ফোর্ড করটিনা ১৯৬৮ মডেল), WBJ 2741, হিলম্যান, WBD 1529 (Volks-wagon), WMC-2543 (BMW জারমান মডেল) WMD 6071 (পদ্মিনী প্রিমিয়ার), 1383 (ট্রাক), ASU 7068 (ট্রাক) DHE 9251 (Peangot) প্রভৃতি।

কমিশনার এন সি দত্ত

ইক্যুটি শেয়ার

তপন গুহ, স্বপন গুহ, তরুণ গুহ, সৌমেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবীকা মিত্র, রাজা মিত্রের নামে বিভিন্ন কোম্পানীর ইক্যুটি শেয়ার আছে।

ব্যবসার অংশীদার

(ক) কিন্নরী বিউটি পারলার – ২৩ গড়িয়াহাট রোড।

(খ) আশুতোষ নার্সিং হোম – ২১/বি সদানন্দ রোড।

(গ) ক্যালকাটা কালার লেবরেটরী – টালিগঞ্জ

(ঘ) সাইন পারলার – ১/বৃটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীট।

(ঙ) কৈলাশ হোটেল ও নটরাজ এস্টেট – দার্জিলিং

(চ) লেগ-গার্ড সপ – উল্টোডাঙ্গা রোড

(ছ) ইস্ট কোস্ট ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড

(জ) ইস্ট কোস্ট প্রজেক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড।

(ঝ) ইস্ট কোস্ট এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট প্রাঃ লিমিটেড

(ঞ) ইস্ট কোস্ট ম্যানু এন্ড মার্কেটিং লিমিটেড।

(ট) ইস্ট কোস্ট হোটেল (হলদিয়া)

(ঠ) ইস্ট কোস্ট হোল্ডিংস (প্রাঃ) লিমিটেড।

(ড) ঠাকুরদাস সুরেখা আয়রন ওয়ার্কস।

(ঢ) ইস্টার্ণ কমার্শিয়াল করপোরেশন।

(ণ) কেডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ

(ত) সুরফিট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস, ৪ গারস্টিন প্লেস।

(থ) ৪/এ বি বি ডি বাগে ডায়মন্ড সুগার মিলস-এর ৮০০ ইক্যুটি শেয়ার (স্বপন গুহের নামে)

(দ) মাধুরী ইনভেস্টমেন্ট ও মাধুরী ইন্ডাস্ট্রিস

বহুতল বাড়ী ১০৫ নং পার্ক স্ট্রীট এইখানেই সঞ্চয়িতার কর্ণধার শম্ভু মুখার্জীর একটি ফ্ল্যাট ছিল।

(ধ) সুষমা ফারমাসিউটিক্যালস – ৯ রাজা রামমোহন সরণি

এছাড়া বাজেয়াপ্তের তালিকায় আরও অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম আছে।

ভুক্ত ভোগীদের কথা

এইচ এম ভি. র ৩৩ নং যশোর রোডের অফিসের রেডিও অ্যাসেম্বলি ডিপার্টমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র ফোরম্যান চিন্তাহরণ দাস বললেন, প্রথমে দুহাজার পাঁচশো টাকা নিজের নামে ও তিন হাজার টাকা মেয়ের নামে ১৯৭৯ সালে সঞ্চয়িতায় রাখেন। ওই সময় প্রতিমাসেই তিন পারসেন্ট করে সুদ ঠিকমত পেয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে সঞ্চয়িতার ওপর ওঁর একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। এই বিশ্বাসের ফলেই উনি যখন ১৯৮০ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন আরো প্রায় তিরিশ হাজার টাকা ৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিজের নামে (২০০০০) ও স্ত্রী নামে (১০০০০) জমা রাখেন। দুমাস তিন পারসেন্ট সুদ পেয়েছিলেন। কিন্তু ৮০ ডিসেম্বর মাস থেকেই সেই সুদ আসা বন্ধ হয়ে যায়। সুদ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তিনি ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এ কর্মরত সঞ্চয়িতার এজেন্ট ও সাবএজেন্ট শ্রীবাস্তব ও শিবশঙ্কর সরকারকে গিয়ে ধরেণ। ওঁরা তখন চিন্তাহরণ বাবুকে প্রতিশ্রুতি দেন যে কিছুদিনের মধ্যেই আবার সুদ দেওয়া চালু হয়ে যাবে। কারণ চিটফান্ড এ্যাক্ট এর মধ্যে, যে একশ আটটা কোম্পানির নাম আছে তার মধ্যে সঞ্চয়িতা পরে না। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেও প্রায় দু বছর ধরে কোন টাকা পেলেন না। খবরের কাগজে সঞ্চয়িতার সম্বন্ধে নানা রকম খবর দেখতে লাগলেন। একদিন ফ্যান্সি লেনের অফিসে এ ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে গেলেন। সে সময় অফিসে সঞ্চয়িতার আর এক এজেন্ট অরবিন্দ দত্ত (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ কনট্রোল ডিপার্টমেন্টের কর্মী) ওঁকে বুদ্ধি দিলেন যে সঞ্চয়িতার সঙ্গে যখন সরকারের মামলা হয়েছে তখন এ টাকা পেতে অনেক দেরি হবে। তার চেয়ে তিনি যদি ওঁর নামের টাকাটার সঙ্গে আরো কিছু টাকা দিয়ে সঞ্চয়িতারই 'সিস্টার কনসার্ন' 'ক্যালকাটা কনস্ট্রাকসন'এর কয়েকটা বন্ড কিনে রাখেন, তবে টাকাও তাড়াতাড়ি তোলা যাবে আবার তিন পারসেনট করে সুদও পাবেন। অরবিন্দ দত্তর থেকে এই বুদ্ধি পেয়ে চিন্তাহরণবাবু তাই করলেন। নিজের নামের সঞ্চয়িতায় রাখা কুড়ি হাজার টাকার সঙ্গে আরো চার হাজার টাকা যোগ দিয়ে আট হাজার টাকা করে 'ক্যালকাটা কনস্ট্রাকসন'এর তিনটে বন্ড কিনলেন। এই

বন্ড ১৯৮২ সালে কিনেছিলেন। দুমাস ঠিকমত সুদের টাকা পেয়েছিলেন। দুমাস বাদে সে কোম্পানি উঠে যায়। চিন্তাহরণ বাবু আমার কাছে এসব কথা বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলছিলেন। জানালেন,—এই টাকা চোট যাওয়ার ফলে উনি এখন নিজের হাত খরচ চালাতে বাড়িতে বসে রেডিও সারাইয়ের কাজ করেন। ওঁর স্বপ্ন ছিল চাকরি জীবন শেষ করে একটা বাড়ি করার। এরজন্য জমিও কিনেছিলেন কিন্তু এত টাকা নষ্ট হওয়ায় বাড়ি তৈরির স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। ১৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোডের বাসিন্দা চিন্তাহরণবাবু এখন সঞ্চয়িতার এজেন্ট রিজার্ভব্যাংককর্মী অরবিন্দ দত্তের নামে উকিলের চিঠি পাঠাবেন ভাবছেন।

১৩২ এইচ, সাউথসীথ রোডের বাসিন্দা শান্তিগোপাল রায় জানালেন তিনি ১৯৬৮ সালে হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ম থেকে ভলেন্টিয়ার রিটায়ারি করেছেন। এই অবসরের পরে জমানো টাকা নিয়ে চার বোনের বিয়ে দেন বাকি সাত হাজার টাকা উনি সঞ্চয়িতায় জমা দিয়েছিলেন। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ টাকা জমা দেন। মাত্র দু মাস দুশো দশ টাকা করে ও দুমাস সত্তর টাকা করে পাওয়ার পর এই সুদ আসা একদম বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে উনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন। এখন একমাত্র ভরসা পেনসনের অল্প কিছু টাকা। তবে সে টাকা দিয়ে ঠিক মত সারামাস খাওয়াই চলে না।

এ/৪৬ সি. আই. টি. বিল্ডিং কলকাতা-৭ এর অবসর প্রাপ্ত কর্মী যোগেশ সাহা :"আমি কোন দিনই এই সব চিটফান্ডে বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু দিনের পর দিন অফিস বন্ধুদের এই সঞ্চয়িতার থেকে মোটা সুদ পেতে দেখে চার হাজার টাকা ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে জমা দিয়ে ছিলাম। আমাকে এই বন্ড কিনিয়েছিলেন ডানলপ ইন্ডিয়ার এ্যাকাউন্স ডিপার্টমেন্টে কর্মরত সঞ্চয়িতা এজেন্ট বিভূতিবাবুর সাব এজেন্ট দিলীপ মুখার্জী। মাত্র দু মাস তিন পারসেন্ট করে ও দুমাস এক পারসেন্ট করে সুদ পেয়ে আর কোন টাকা পাইনি। আমি বিভূতিবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরও অনেক টাকা চোট গিয়েছে।" □

উদয়ারুণ রায়

শম্ভুর স্বীকারোক্তি

শম্ভু মুখার্জির আদি বাড়ি চন্দননগরে। অল্প বয়েসেই মা-বাবা হারান। পরে মানুষ হন তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি রুমে। জনৈকা বিধবা ভদ্রমহিলাই তাঁকে মানুষ করেন।

লালবাজার লক-আপে আটক থাকার সময় শম্ভু মুখার্জি পুলিশের কাছে যে স্বীকারোক্তি করেছেন, তা থেকে ওঁর জীবনের এবং সঞ্চয়িতার অনেক গোপন তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যগুলো পেয়ে পুলিশ সেগুলো যাচাই করার চেষ্টা করেনি। অন্যের পক্ষে সত্যাসত্য নিরূপণ কঠিন। আমরা শম্ভুনাথের স্বীকারোক্তি ছাপছি এই আশা নিয়ে যে, একদিন সত্য উদঘাটিত হবে।

শম্ভুনাথের কর্মজীবন শুরু হয় একজন কেরানী হিসেবে। স্টিফেন হাউসে মুরারকা পেন্টস-এ প্রথমে কেরানী, পরে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করেন। ছোটবেলায় পোলিও হয়েছিল। তখন থেকে একটা পা দুর্বল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন। মুরারকা পেন্টস-এ শম্ভুর সংগে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির আলাপ, পরে ঘনিষ্ঠতা। সঞ্চয়িতার আইডিয়া তাঁরই। পরে ইন্ডিয়া ফ্যান-এর ডিরেক্টর গোপাল কেডিয়ার সংগে হৃদ্যতা। আরও পরে তপন গুহ ও স্বপন গুহ খুব কাছে এসে যান।

সঞ্চয়িতা শুরু হয় ফুটবল প্লেয়ারদের কালোটাকা দিয়ে। এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন রজত চক্রবর্তী। তালতলায় যে বাড়িতে শম্ভু থাকতেন, তারই একটি ফ্ল্যাটে ছিলেন রজত। শম্ভু জানিয়েছিলেন, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রাই সঞ্চয়িতাকে বড় হতে সাহায্য করেন। শম্ভু যাঁদের নাম করেন, তার মধ্যে পি. কে. ব্যানার্জি এবং চুনী গোস্বামীর নামও আছে।

ফুটবল তারকাদের জয় করার পর সিনেমা-তারকাদের মনজয়ের দিকে নজর দেওয়া হয়। শম্ভু পুলিশের কাছে যে তালিকা দিয়েছিলেন, তার সকলেই দিকপাল। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া, মুনমুন সেন, আলপনা গোস্বামী – শম্ভু দাবি করেছেন এঁদের সকলেরই টাকা গচ্ছিত ছিল সঞ্চয়িতায়।

চিত্রাভিনেত্রী আলপনা গোস্বামীর বিরুদ্ধে শম্ভু অনেক অভিযোগ করেছেন। যাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন নি, তার মধ্যে সুচিত্রা সেন পড়েন। শম্ভুর অভিযোগ, সঞ্চয়িতার টাকায় আলপানার নামে একটি ফ্ল্যাট কেনার ব্যবস্থা করেন সঞ্চয়িতার একজন ডিরেক্টর। আলপনার সংগে জর্জ বেকারের বিয়ের পর ফ্ল্যাটটি বিক্রির চেষ্টা হয়। ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন থেকে আপত্তি জানান হয়। সঞ্চয়িতার চিত্রতারকাদের মধ্যে যাঁদের নামে মোটা টাকা গচ্ছিত আছে, পুলিশকে তাদের একটি তালিকা দেন শম্ভু। এ তালিকায় সুচিত্রা সেন, ধর্মেন্দ্র এবং হেমামালিনীর নাম আছে।

সঞ্চয়িতায় পুলিশের বড় কর্তাদের টাকাও ছিল। শম্ভু যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে প্রাক্তন জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার রামচন্দ্রন, (৫০ হাজার), বর্তমান জয়েন্ট কমিশনার বি. কে সাহা (১৫ হাজার) এবং বর্তমান পুলিশ কমিশনার বিকাশকলি বসুর কিছু আত্মীয় স্বজনের নাম আছে। এঁদের সকলের টাকাই নাকি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শম্ভুর ধরা পড়ার কাহিনী রীতিমত চমকপ্রদ। লালবাজারে রুনুগুহ নিয়োগীর একজন সোর্স রাত এগারটা নাগাদ তাঁকে খবর দেয়, শম্ভু কলকাতায় এসেছেন। দক্ষিণ কলকাতার একটি হোটেলে উঠেছেন। কলকাতায় এসেছেন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর একজন অফিসার এবং ভারত সরকারের একজন ডেপুটি সেক্রেটারির সংগে দেখা করতে। রুণু ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর অফিসারের সংগে সাক্ষাৎ করেন। এই অফিসারের স্ত্রী তখনকার পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি বললেন, শম্ভু কলকাতায় এসেছেন দুজন মাড়োয়ারীর কাছ থেকে টাকা নিতে। ঠিক হয়েছিল, রুণু দুজন মাড়োয়ারী সংগ্রহ করবেন। তারপর চারজন যাবেন হোটেল ব্লিৎস-এ।

সকাল আটটায় ওঁরা হোটেল ব্লিৎস-এ হাজির হন। প্রথমে দেখা করতে যান দুজন মাড়োয়ারি। হোটেল ব্লিৎস-এর বার নম্বর কক্ষে উঠেছিলেন ডঃ এস. ভৌমিক। হোটেলকে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। একটি সেমিনারে বক্তৃতা করতে এসেছেন। মাড়োয়ারি দুজনকে প্রথমে পাঠান হল। তাঁরা বেরিয়ে এসে জানালেন, ডঃ এস ভৌমিকই শম্ভু মুখার্জি। রুণু ঝট করে ঘরে ঢুকেই বললেন, কী শম্ভু, কেমন আছ? গরিবের টাকা ফেরৎ না দিলে তোমাকে ছাড়ব না।

রুণু গুহ নিয়োগীকে দেখেই শম্ভু পেচ্ছাপ করে দেয়। তারপর বাথরুমে যেতে চায়। বাথরুম থেকে ফিরতেই তাঁকে লালবাজার লক-আপে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ সময়ে লালবাজার লক আপে ছিল হেমেন মন্ডল। শম্ভু হেমেনকে বলেছিল, এখানকার বাথরুমে সে আত্মহত্যা করতে চায়। হেমেন বলেছিলেন, সে চেষ্টাও করবেন না। এখানকার সিসটার্নের চেনগুলো প্লাসটিকের। এর সাহায্যে মৃত্যু সম্ভব নয়।

পুলিশ ও কথা জানত। তা সত্ত্বেও চৌরঙ্গীর বাড়ি থেকে পুলিশ পরিবৃত শম্ভু কি করে ঝাঁপ দিল বুঝে ওঠা কঠিন। □

অজিত চক্রবর্তী

কেনারামের ওভারকোট ও আহ্লাদির কুকুর

রূপক গুপ্ত

যদিও শখ আর সাধ অনেক, তবু এই টাউন বাজারে এসে 'কিনি' ওরফে কেনারাম বাউড়িকে বড়ো হিসেব করে চলতে হয়। তাই সকালে কারখানায় বেরুবার সময় আস্তানা থেকে খানকয়েক বাসি রুটি কাগজে মুড়ে পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। তারপর বস্তির গলির মোড়ে নেতাই-এর চায়ের দোকানে বসে গেলাসের গরম চায়ে চুবিয়ে সেগুলোর সদ্‌গতি করে। দোকানে বসে সে যখন এই পর্বটা সারে তখন রোজই সে একটা ব্যাপার দেখতে পায়; পার্কের ওপাশে পায়সাঅলা ভদ্দরলোকদের পাড়া থেকে রোজ এক লম্বা চওড়া ভারিক্কি চেহারার মানুষ মুখে একটা মোটা চুরুট নিয়ে ব্যাগ হাতে বাজারের দিকে যায়। গরমের দিনে তাকে ঢোলা পায়জামার সঙ্গে হাঁটু অব্দি নামানো আর কোমরে বাহারে সুতোর বিনুনি বাঁধা ঢিলেঢালা একটা জামা পরতে দেখেছে কেনারাম। এখন এই শীতের দিনে ঠিক ওইরকম ঝুলেরই একটা কোট গায়ে দিতে দ্যাখে, মাথায় থাকে একটা টুপি। আর তাইতে লোকটাকে বেশ দেখায়। এমনিতেই চেহারাটা ভারিক্কি গোছের। এসব পরলে তাকে যেন আরো মান্যিগন্যি বলে মনে হয়। দোকানের বাইরে পাতা বেঞ্চিটায় বসে বাসি রুটির সঙ্গে চা খেতে খেতে লোকটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে কেনারাম, আর ভাবে, তারও যদি ওইরকম একটা কোট থাকতো তবে তাকেও বেশ মান্যিগন্যির মতো দেখাতো।

এই টাউনবাজারে কেউ মান্যি করুক চায় না করুক, মাকড়িপোতার মানুষরা নিশ্চয় অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতো আর মনে মনে ভাবতো, পদু বাউড়ির ব্যাটা 'কিনি' না জানি টাউনবাজারে কত উঁচুদরের একটা চাকরি করে। ঠ্যাকারে আহ্লাদিরও মাটিতে পা পড়তো না। নিজের মনে, গাঁয়ের বউঝিদের গাল পেড়ে বলতো, 'দ্যাক্‌রে চোকখাগিরা, কেমুন কপালখানা কইরেচি দ্যাক! এই গাঁঘরে কার মরদ এমুন পুষাক পিনবার কপাল ক'ইরেচে!'

না, যেমন করেই হোক, ওরকম একটা কোট তাকে কিনতেই হবে। তা যতো দামই হোক আর যতোদিনেই সে তা পারুক না কেন। এর জন্যে তাকে যদি পেটে কিল মেরেও পড়ে থাকতে হয় সে ভি আচ্ছা, তবু কোট একটা তার চাই-ই।

ক'দিন পরে তাদের কারখানার গেটের কাছে রাস্তার পাশে একটা লোককে ওইরকম কিছু কোট ঢেলে বেচতে দেখে সে এগিয়ে যায় সেদিকে। 'হপ্তা' পেয়ে সেদিন তার পকেটও গরম ছিল। অনেকগুলো কোট নেড়েচেড়ে শেষ পর্যন্ত ওরই ভেতর থেকে দামে শস্তা অথচ দেখতে একেবারে খারাপ না হয় এইরকম একটা কোট কিনে ফেলে। তারপর সুতীর চাদরটা গা থেকে খুলে কোটটা গায়ে চাপিয়ে বস্তির দিকে রওনা দেয়। সে বেশ বুঝতে পারে, কোটটা গায়ে চাপিয়ে তার হাঁটার ধরণটাই একেবারে পাল্টে গেছে।

নেতাইয়ের দোকানোর সামনে এসে দাঁড়াতে সে বেশ একটু চমকে ওঠার সুরে বলে, 'কী রে তু যে একদোম সাহেব বনে যেছিস! ইবার মাথায় একটো টুপি আর মুখে চুরুট লাগাইলে পুরাপুরি তুকে উই রায়সাহেবের মতো দেখাইবে।'

'কী যে বুইলচো নেতাইদা তার ঠিক নাই।' একই সঙ্গে খুশী আর লজ্জা প্রকাশ পায় কেনারামের গলায়।

নেতাই বলে, 'হাঁ রে হাঁ, ঠিকই বুইলচি আমি, রাস্তা দিয়ে যোখোন চইলবি তোখোন দেইখ্‌বি তুকে দেখে সোবাই রাস্তা ছেয়ড়ে দাঁড়াইছে। তার তুর বউ, সি বিটি তো তুকে দেখে ভোয়েই পালাইবে।'

'লা গো নেতাইদা, আহ্লাদি আমার খুব ডাঁটো মেইয়েছেলে, উর মনে ডয়ডর বলে কিছু নাই।' কেনারাম লাজুক গলায় কথাটা বলে বটে, কিন্তু তার চিন্তাটা তখন অন্যরকম এক

দৃশ্যে পৌঁছে গেছে সে তখন ভাবছে, সত্যিই যদি এই কোট পরে আর ওইরকম এক টুপিতে মাথা ঢেকে মুখে মোটা চুরুট লাগিয়ে বাড়ি গিয়ে হাজির হয় তাহলে আহ্লাদি না জানি কেমন হকচকিয়ে যাবে। প্রথমটায় হয়তো মনে করবে, বাউড়ি পাড়ায় হঠাৎ হঠাৎ যেমন হাঁড়িয়া-পুলিশের উৎপাত হয় সেইরকমই বুঝি কিছু ব্যাপার। এই মনে করে সে ঘরে যদি কোনো 'মাল' থাকে তবে সেসব তখুনি কোথাও লুকিয়ে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তারপর ছেনালের মতো তার সামনে এসে একগাল হেসে আঙুল মটকাতে মটকাতে বলবে, 'না গো হুজুর, মরদ আমার টাউনবাজারের কলে চাকরি পেইয়েছে। আমি এখোন উসব কারবার কইরতে যাবো কেনে! কোন্ অনামুখা তুমায় মাল খুঁজবার লেগে ইখানে পাঠাইছে! হারামজাদারা নিব্বংশ হবে, হাড়ে ঘুণ ধইরবে।'

'না তুর উসব ছিনালি কথা শুইনতে চাই না, আমি তুর ঘর দেইখবো। সর___সইরে দাঁড়া।' যতোটা পারা যায় ভারি ভারি গলায় কথাগুলো বলে এক ধাক্কায় আহ্লাদিকে সরিয়ে কেনারাম ঘরে ঢুকতে চাইবে। আহ্লাদি তখন উপায় না দেখে হুমড়ি খেয়ে হয়তো তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদবে। আর তখনই কেনারাম নিজের কপাল পর্যন্ত ঢাকা টুপিটা খুলে হো হো করে হেসে উঠবে।

হক্চকানি, খুশী আর বুঝতে না পারার লজ্জায় আহ্লাদির পান দোক্তা খাওয়া টোপাপানা মুখের চেহারাটা যে কী রকম হয়ে উঠবে___সেটা কেনারাম চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায়। সে ভাবে, না আর দেরী নয়, সামনের শুক্কুরবারেই সে বিকেলের গাড়ি ধরে বাড়ি যাবে। হ্যাঁ, তার আগে ওই লোকটার মতো কপাল পর্যন্ত ঢাকা একটা টুপিও কিনতে হবে তাকে। কোটটার মতো পুরোনো পায় তো ভালই, নইলে নতুনই কিনবে। আর কয়েকটা শস্তাদামের চুরুট। সেগুলো গাঁয়ে গিয়ে সময় আর জায়গা বিশেষে ধরাবে।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, কিছুদিন থেকে আহ্লাদি যে আবার ওর কুকুরটার জন্যে ঘুঙুর বাঁধা এক বকলস কিনে দেবার জন্যে ঘ্যানর-ঘ্যানর শুরু করেছে। কী যে এক শখ চেপেছে ওর, নেড়ি কুত্তা, তার জন্যে আবার সাতসতেরো বায়নাক্কা। তাও যদি বাচ্চা থেকে পুষতো তাহলেও না কথা ছিল। ধেড়ে একটা কুকুর, কোত্থেকে নিজেই এসে বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে। প্রথম প্রথম দু'চার দিন বাড়ির এঁটোকাটা ওর সামনে ধরে দিয়েছিল আহ্লাদি। সেই থেকেই তাকে দেখলে লেজ নাড়া, তার পিছু পিছু ঘোরা। আহ্লাদি আবার আদর করে ওর নাম রেখেছে কালু।

তা কালু এখন এমন হয়েছে যে আহ্লাদি যদি পাড়া বেড়াতে বেরোয় বা কিছু কেনার থাকলে হাটতলায় যায় তো সেও লেজ নাড়তে নাড়তে তার সঙ্গে যাবে। মোটেই কাছছাড়া হতে চায় না। এবার কার্তিকপুজোর দিন বাবুপাড়ায় যাত্রা দেখতে গিয়ে সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার হয়েছিল। আহ্লাদি গিয়ে মেয়েদের জায়গায় বসলে কালুও অমনি তার পাশে গিয়ে বসলো। তাইতে আশপাশের মেয়েরা হেই-হেই করে ওকে তাড়াতে গিয়ে এমন ক্যাচর ম্যাচর শুরু করে দিল আর আহ্লাদিকে এমন সব কথা শোনাতে লাগল যে, যাত্রা দেখা মাথায় উঠলো তার। অবিশ্যি সহজে আসতে চায়নি সে। প্রথমটায় সেও কালুকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। তাড়িয়ে একেবারে বারোয়ারী-তলার সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে খুব ধমক ধামক আর চড়চাপড় দিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসেছিল। কিন্তু বসলে হবে কি, খানিক পরেই কালু আবার প্যান্ডেলের কাছে এসে আহ্লাদি যেদিকটায় বসে ছিল সেই দিকে মুখ তুলে এমন মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিল যে শেষ পযর্ন্ত বাবুপাড়ার ছেলেরাই লাঠিসোটা নিয়ে ওকে তেড়ে গিয়েছিল। হয়তো পিটিয়েও ছিল খুব। তাই আর প্যান্ডেলের ধারে কাছে ঘেঁষেনি। ভোরবেলায় বাড়ি ফেরার সময় আহ্লাদি দেখে বাবুপাড়ার শেষে মাঠের কিনারে যেখানে অজস্র ঝুরিনামা বিরাট এক বটগাছ রয়েছে, রাস্তার ধারে সেই বটগাছের নীচে কালু চুপচাপ বসে জুলজুলে চোখে চেয়ে আছে বাবুপাড়ার দিকে মুখ করে। ভোরের আবছা আলোতেই সে আহ্লাদিকে দেখে চিনতে পেরে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে তার দিকে। কাছে এসে তার কাপড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে গলায় কুঁই কুঁই ক'রে এমন একটা আওয়াজ করে যা দেখে সঙ্গীরা বলে ওঠে, 'অ মাগো, ই যে দেখছি তুর প্যাটের ছেইলেরও বাড়া রে! সোবাই মিলে এতো মারধোর দিলো তবু ইখানেই রাতভোর বইসে রয়েঁচে!'

'তা উ কী কইরবে! উর ঘুম দিবার সময় কেউ এসে যদি মাচান থিকে লাউ কেটে লিয়ে যায় তো উ জাইনবে কী ক'রে বল!' আহ্লাদি কালুর হয়ে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে।

এসব ব্যাপার কেনারাম অবিশ্যি নিজে কিছু দেখেনি, আহ্লাদির মুখে শুনেছে, বলেছে পাড়ার লোকরাও।

যাই হোক, একটা নেড়ী কুত্তা নিয়ে আহ্লাদির এই আদিখ্যেতা___এটা কেনারামের কাছে ভালো লাগে না মোটেই। তাও যদি কুকুরটা তেমন তেজী হতো বা বাড়ি পাহারা দেবার কাজে লাগতো তাহলেও না হয় কথা ছিলো। কিন্তু তা যে নয়। সারাদিন উঠোনের পেয়ারাগাছটার নীচে মটকা মেরে পড়ে থাকা আর দু'বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি গেলা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। বাড়িতে একটা অচেনা লোক ঢুকলেও তার কোনো সাড় থাকে না। তাই দিব্যি বাড়িতে চোর ঢুকে উঠোনোর লাউমাচা থেকে দু'দিন দু'টো লাউ কেটে নিয়ে চলে গেছে।

মাঝে মাঝে বাড়ি গিয়ে কেনারাম যখন আহ্লাদির মুখে এসব কথা শোনে তখন যতো রাগ গিয়ে পড়ে ওই কুকুরটার ওপর। আহ্লাদিকে সে বলে, 'বাড়িতে ঢুকে চোর যদি সব চুরিই করে লিয়ে যায়, তবে উকে তু পুষছিস কেনে! দু'বেলা কাঁড়া কাঁড়া খেইতে দিয়ে উর গতরটো বানাবার লেগে!'

'তা উ কী কইরবে! উর ঘুম দিবার সময় কেউ এসে যদি মাচান থিকে লাউ কেটে লিয়ে যায় তো উ জাইনবে কী ক'রে বল!' আহ্লাদি কালুর হয়ে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে।

কেনারাম বলে, 'চোপর দিন তো ঘুমায়েই থাকে, কখুনো তো জেইগে থাইকতে দেখি না। যেমোন হয়েছে মালিক তেমনি তার কুত্তা।'

'খবরদার বুইলচি, আমার ঘুমের খোঁটা দিবে না!' আহ্লাদি কপট রাগে ফুঁসে ওঠে।

কেনারাম হাসতে হাসতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা বাপু, ঘাট হইয়েছে, কিন্তু উই কুকুরটোকে তুই ভাগা দেখি। উটো আমার দু'চোখের বিষ।'

'কেনে কী ক্ষতিটো উ তোমার কইরেছে?'

'খেয়কে উবগারটাই বা তোমার কী কইরছে?

'কইরবে কইরবে—ঠিক কইরবে।'

'ঘোড়ার ডিম কইরবে। উর ধরণ দেখলেই বুঝা যায়, কোনো কম্মের লয়। তু দে দিকি লাঠিটো, মেইরে আমি উকে বাড়ি থিকে ভাগায় দি।'

'না, খবরদার বুইলচি, তুম উকে মাইরবে না। মাইরলে আম্মো উর সাথে বাড়ি থিকে চইলে যাবো।'

'কেনে রে___উ হারামজাদার উপর তুর এতো টান কেনে? উ কি তুর সগ্গে বাতি দিবে?'

'হাঁ হাঁ তাই দিবে।' একটু থেমে আহ্লাদি এবার প্রচন্ড অভিমানে বলে, 'লিজে তো টাউনবাজারে যেয়ে সখের পেরান গড়ের মাঠ কইরে বেড়াচ্চো, আমি ইদিকে ছোট ছেইলেটোকে লিয়ে এই গাঁঘরে কী কইরে দিন কাটাই সি কথাটো কি একবার ভেইবে দেকেচো! এতো যে বলি, উ গো আমাদিগেও টাউনে লিয়ে চলো, সিকথা তো কানে লাও না। শুধু একটো কুকুর পুইষতে দেখেই তুমার তো জ্বালা।'

কথাটা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে কেনারাম এবার খানিক বেকায়দায় পড়ে বলে ওঠে, 'পুষ বাবা পুষ___যোতো খুশী তু পুষ। আমি আর কিছু বুইলবো না তুকে।'

তা সতিাই, কেনারাম কুকুর নিয়ে আর কোনোদিন কথা শোনায়নি আহ্লাদিকে। তবে সব সময় মটকা মেরে পড়ে থাকা জন্তুটার ওপর মনে একটা বিদ্বেষভাব তার রয়েই

লেছে। তাই আহ্লাদি এতোবার বলাতেও সে কুকুরটার জন্যে বকলস কেনার তেমন গা করেনি। তাই বলে সে যে কেপ্পন একথা তার অতি বড় শত্তুরেও কোনোদিন বলবে না। যখনই সে বাড়ি যায় তখনই কারুর না কারুর জন্যে কিছু একটা কিনে নিয়ে যায়। এই তো এর আগের বারই নসুর জন্যে একটা রঙচঙে সোয়েটার আর তার আগের বার আহ্লাদির জন্যে একজোড়া তোড়া কিনে নিয়ে গিয়েছিল। তোড়া পেয়ে মনে মনে খুশী হলেও মুখে আহ্লাদি বলেছিল, 'আবার আমার জইন্যে ইসব কিনা কেনে। ধুমসি মাগী হয়ে তুড়া পায়ে দিয়ে আমি ঘুইরে বেড়াবো নাকি!'

'না রে না, তুকে খুব ভালো মানাইবে, তুর পায়ের গোছগুলান কেমন ভরাট ভরাট, ওই পায়েই তো তুড়া মানায়।' কেনারাম হাসতে হাসতে বলেছিল।

তা সত্যিই খুব ভালো মানিয়েছে আহ্লাদিকে। তোড়া দুটো পায়ে দিয়ে সে এখন দিব্যি কোমর দুলিয়ে এপাড়া-সেপাড়া ঘুরে বেড়ায়। ওটা পায়ে দেবার পর থেকে ওর পা ফেলার ধরণটাই যেন বিলকুল পাল্টে গেছে।

তা নিজের তোড়াই হোক আর যা-ই হোক, কুকুরের গলার বকলস-এর কথা বলতে কিন্তু ভোলে না আহ্লাদি। এবারও বাড়ি থেকে আসার সময় কেনারামকে পাইপই ক'রে কথাটা বলে দিয়েছে। কিন্তু বললে হবে কি, কেনারাম কিনলে তো। ওসব বাজে ব্যাপারে পয়সা নষ্ট করতে সে মোটেই রাজি নয়। আহ্লাদিকে অবিশ্যি মিথ্যে ক'রে কিছু একটা বলতে হবে, বলবে টাউনবাজারের অনেক দোকানে খোঁজ করেও জিনিসটা পাওয়া যায়নি।

কিন্তু সেসব বলার কি এবার দরকার হবে? হয়তো নাও হ'তে পারে। কেননা তার গায়ে এই লম্বা ঝুলের কোট, মাথায় কপাল পর্যন্ত ঢাকা টুপি আর মুখে মোটা চুরুট দেখে আহ্লাদি এমন হক্চকিয়ে যাবে, এতো খুশী হবে যে তার কুকুরের গলায় বকলস হলো কি হলো না তা নিয়ে মাথাই ঘামাবে না। হকচকিয়ে যাওয়া আর তারপর খুশী হওয়া আহ্লাদি পানদোক্তা খাওয়া টোপা মুখখানা চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে কেনারামের টুপি কেনার ঝোঁকটা এমন চেগে ওঠে যে পরের দিনই সে একটা টুপি কিনে ফেলে। তারপর শুক্কুরবার পর্যন্ত কোনোরকমে কাটিয়ে সেদিন সন্ধ্যের ট্রেনেই সে রওনা দেয়। শনি আর রবি-সপ্তাহে এই দুটো দিন তাদের কারখানা বন্ধ থাকে। তাই মাকড়িপোতায় গেলে শুক্কুর আর শনির রাত কাটিয়ে রোবারের সন্ধ্যেয় আবার ওখান থেকে রওনা দেয়। নইলে সোমবার সকালে কারখানায় হাজরে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এবার বাড়ি যাবার সময়টাতেই রাস্তায় এমন একটা ফ্যাকরা দেখা দিল যার জন্যে ট্রেনেই তাকে সারাটা রাত কাটাতে হলো। যেখানে রাত এগারোটার ভেতরেই তার মাকড়িপোতায় পৌছে যাবার কথা, সেখানে ট্রেন এসে পৌছুলো ভোরবেলায়। কোথায় রেললাইনে কী একটা গন্ডগোল হয়েছিল বলে গাড়িটাকে মাঝরাস্তায় ঘন্টাছয়েক দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। না খাওয়া না ঘুমে মেজাজটা তাই খুব তিতিবিরক্ত হয়ে ছিল কেনারামের। তবু ভোরবেলায় যখন মাকড়িপোতায় এসে গাড়িটা থামে তখন গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই তার টুপিটা মাথায় দেওয়ার কথা মনে পড়ে। কোটটা গায়ে চাপানোই ছিল, এবার টুপিটা সে কায়দা ক'রে মাথায় দেয়। এই পোশাকে প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে সে যখন হাঁটতে শুরু করেছে তখন লক্ষ্য করে গাড়ি থেকে নামা এক দঙ্গল মেয়েছেলে তাকে দেখে দুড়দাড় ক'রে দৌড়োতে শুরু করেছে। প্রথমে এর কারণটা বুঝতে পারে না কেনারাম, পরে বোঝে, তার গায়ের এই কালো কোট আর মাথার টুপিটা দেখে ওরা তাকে 'টিকিস ম্যাস্টর' বলে ঠাউরেছে। এতে কেনারাম খুব মজা পায়। ভাবে, বোর আসল মানুষটা না জানি তাকে দেখে কী ভেবে বসবে!

বাড়ি গেলেই যেন মজার এক ঘটনা ঘটবে___এইরকম এক আশা নিয়ে কেনারাম চুরুটটা ধরিয়ে জোর কদমে বাড়ির দিকে এগোয়। ট্রেন থেকে নামা দু'একজন যাত্রী ছাড়া রাস্তায় আর কোনো লোক নেই। এই শীতের ভোরে এখনো গাঁয়ের লোকের ঘুমভাঙেনি। বাউরিপাড়ায় ঢুকেও সেই একই অবস্থা দেখতে পায় সে। এখনো যে যার ঘরে কাঁথাকানি মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে শুকড়ে পড়ে আছে। এখন গিয়ে আহ্লাদিকেও হয়তো ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হবে তাকে। ব্যাপারটা ভাবতে এতোক্ষণের উৎসাহটা কেমন একটু দমে যায়। ভাবে, ডেকে তুলতে গেলে তো আর গলার আওয়াজেই আহ্লাদি তাকে চিনে ফেলবে, যেভাবে ওকে ভড়কে দিয়ে একটু মজা করবে ভেবেছিল তা আর হবে না।

তবে এক কাজ করা যেতে পারে, মুখে কোনো আওয়াজ না করে শুধু কপাটের শেকলটা ধরে নাড়া দেবে। তারপর ও ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে দরজা খোলবার আগেই সে টুপিতে কপালটা আরো ভালোভাবে ঢেকে মুখেচোখে বেশ একটা থমথমে ভাব নিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাহলে হয়তো সে যেরকমটা ভেবেছিল সেইরকম কিছু ব্যাপার ঘটে যাবে। ভারি মজার ব্যাপার হবে তাহলে; আহ্লাদি সত্যিই যদি তাকে না চিনতে পেরে হাঁড়িয়া-পুলিসের লোক ভেবে ভয় পায়, আর তাইতে সেও যদি আরো মজা করার জন্যে নিজের গলার আওয়াজটা পুরো পাল্টে ফেলে ঘর সার্চ করার হুমকি দেয়, আর সেই হুমকিতে ও যদি সত্যি সত্যিই তার পায়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তখনই সে নিজের টুপিটা খুলে হো হো করে হেসে ধরা দেবে।

না তখনও নয়, ধরা, আর একটু পরে দেবে। তার আগে আহ্লাদিকে হেঁচকা টানে বুকের ওপর জাপ্টে ধরবে। আর তাইতে ও যখন ছাড়া পাবার জন্যে তাকে আঁচড়াতে কামড়াতে যাবে, নইলে গলা ছেড়ে পাড়ার লোককে জড়ো করতে চাইবে ঠিক তখনই টুপিটা খুলে ধরা দিলে ব্যাপারটা আরো জমজমাট হবে। কেনারাম নিজের এই রগড় করার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির কাছকাছি চলে এসেছিল।

হ্যাঁ, সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই, এখনো

আহ্লাদির ঘুম ভাঙেনি। এমনকি ওর সখের কুকুরটা পর্যন্ত দাওয়ার এক কোণে কুকড়ি-সুঁকড়ি মেরে পড়ে আছে। আহ্লাদি আবার ওর জন্যে খানিকটা খড় বিছিয়ে দিয়েছে। কুকুরটাকে নিয়ে আহ্লাদির এই আদিখ্যেতা দেখলে যেমন রাগ হয় তেমনি আবার হাসিও পায় কেনারামের।

কিন্তু এ কি! কুকুরটা তাকে দেখে কয়েকবার ডাক দিয়ে অমন উঠে দাঁড়াল কেন! সব্বোনাশ! ঘেউ ঘেউ করে যে তেড়ে আসছে এদিকে! কামড়াবে নাকি তাকে!

কেনারাম এতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল, এবার জুতো সমেত পা-টা জোরে জোরে কয়েকবার মাটিতে ঠুকে সেও ওকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কুকুরটা ভয় তো পায়ই না, উল্টে তার চীৎকার আরো বেড়ে যায়।

আর সেই চীৎকারে আহ্লাদি পড়িমরি করে ঘুম থেকে উঠে 'ওগো আজ আবার কোন্ অনামুখো আমার লাউ চুরি কইরতে এইসেচে গো!' বলতে বলতে কপাটের আগল খুলে বাইরে বেরোয়। আর তার পেছনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নসুও বেরিয়ে আসে। কেনারামকে এক নজর দেখে সে বলে, 'অ-মা, ই যে দেক্‌চি ছাহেব চোর গো!'

ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে কেনারাম এবার হাঁক পেড়ে বলে, 'হেই আহ্লাদি, তুর কুকুর সামাল, লইলে উকে আজ আমি জানেই মেইরে ফেইলবো।'

গলার আওয়াজে চিনতে পেরে আহ্লাদি ফিক্ করে হেসে ছেলেকে বলে, 'উরে নসু, উ চোর লয় রে, ছাহেবও লয়, উ তুর বাপ বটে।'

গলার আওয়াজে নসুও বুঝতে পেরেছিল। তাই মায়ের বলার আগেই সে বাপের এই হেনস্থায় বেশ মজা পেয়ে হি-হি করে হাসতে শুরু করে দিয়েছিল। আর সেই হাসির ছোঁয়াচ আহ্লাদিকেও এমন পেয়ে বসে যে হাসতে হাসতে তারও গায়ের কাপড় খসে পড়ে। ওদিকে আবার মনিবানিকে ঘর থেকে বেরুতে দেখে কুকুরটার তেজ আর সাহস দশগুণ বেড়ে যায়। এতোক্ষণ তফাতে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছিল, এখন একেবারে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ভাবভঙ্গী করে। সেই সঙ্গে ওর গলার আওয়াজটাও আরো গম্‌গমে হয়ে ওঠে।

একদিকে কুকুরের এই তেড়ে আসা, তার ওপর তার এই বাড়িতে ঢুকতে না পারার হেনস্তা দেখে বউ-বেটার মজা পাওয়া___এ যেন দপ্ ক'রে আগুন জ্বেলে দেয় কেনারামের মাথায়। সেও সমানে মাটিতে পা ঠুকে কুকুরটাকে তেড়ে যায়। তাইতে কুকুরটা খানিক পিছোয় বটে, কিন্তু তারপরই আবার আগের চেয়ে আরও বেশী তেজে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। কেনারাম চীৎকার করে বলে, 'ভালো চাস তো তুর কুকুর সামাল আহ্লাদি,

গলার আওয়াজে চিনতে পেরে আহ্লাদি ফিক্ করে হেসে ছেলেকে বলে, 'উরে নসু, উ চোর লয় রে, ছাহেবও লয়, উ তুর বাপ বটে।'

লইলে উকে আমি জানে খতম কইরে দুবো।'

আহ্লাদি হাসতে হাসতে বলে, 'সামাল দিবার দরকার নাই, তুমি বাপু তুমার গা থিকে ওই কোট আর মাথা থিকে ওই টুপিটো খুইলে ফেলো; তোবেই উ ঠান্ডা হোবে।'

'কী বুললি! তুর কুত্তার ভয়ে আমি টুপি আর কোট খুইলবো!' কেনারাম আরো রেগে যায়।

কিন্তু আহ্লাদি তখনো হাসতে হাসতে বলে, 'উ গুলান পইরে তুমায় যে ভূতের পারা দেখাচ্ছে; সিজন্যেই তো উ চিল্লাচ্ছে। ভাইবৃচে ই আবার কে বাড়িতে ঢুইকচে!'

'কী বুললি! আমায় ভূতের পারা দেখাচ্ছে! মেইরে তুকে আমি শ্যাষ কইরে ফেইলবো। তুর যতো বড়ো মুখ লয় ততো বড়ো কথা!'

ছেলের সামনে কেনারাম এরকম হম্বিতম্বি করায় আহ্লাদিরও মনে অপমানের জ্বালা ধরে। সেও সমান তেজে বলে ওঠে, 'উঁ___শ্যাষ কইরে ফেইলবে! ফেইলেই হলো আর কি! আম্মোও সহায়রামের বিটি। কাউকে তুয়াক্কা করি না। তা সে ভাতারই হোক, আর ভাতারের বাপই হোক। ভূতের পারা দেখাচ্ছে বইলেচি তো অমনি গায়ে জ্বালা ধইরে গেছে। ঢঙের কোট আর টুপি পইরে ভাইবৃচে আমি কি না কি হয়ে গেচি!'

'হারামজাদি, তু এই কোট আর টুপির কদর কী বুইঝবি!'

'বেশী বুইঝবার দরকার নাই, যা বুইঝবার তা ওই কালুই বুইঝে ফ্যালেছে। এখন ভালো চাও তো উগুলান ঝটপট খুইলে ফ্যালো।'

ইতিমধ্যে চ্যাঁচামেচিতে আশপাশের দু'চারটে বাড়ি থেকে লোকজনও এসে জড়ো হয়েছে উঠোনে। তারাও ব্যাপারটা দেখে বেশ মজা পাচ্ছে। পাড়াসুদ্ধ লোকের সামনে নিজের বাড়িতে ঢোকার এই হেনস্থায় কেনারামের মনে একটা অপমানের জ্বালাও ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। রাগে গরগর করতে করতে সে এবার তেড়ে গিয়ে কুকুরের পেছনের ঠ্যাং দুটো ধরে বোঁ বোঁ করে সেটাকে নিয়ে কয়েকবার চক্কর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাশের পাঁকভর্তি ডোবাটার ভেতর।

থক্‌থকে পাঁকের ভেতরে পড়ে প্রথমে কেঁউ কেঁউ ক'রে খানিক ডাক ছাড়ে কালু। তারপর হক্‌চকানি সামলে সেখান থেকে উঠে আসবার চেষ্টা করলে তার পাগুলো পাঁকের ভেতরে আরো গেঁথে যায়। সেই অবস্থাতেই সে সেখানে দাঁড়িয়ে কেঁউ কেঁউ ক'রে একনাগাড়ে কাঁদতে থাকে। কুকুরের এই শাস্তিতে মনে মনে খুব খুশী হয় কেনারাম।

ওদিকে আহ্লাদি কেনারামের এই কান্ড দেখে প্রথমটায় খুব হক্‌চকিয়ে যায়। তারপর কালুর পরিত্রাহী চীৎকারে হঠাৎ তার খেয়াল হয়, আগে ওকে পাঁকের ভেতর থেকে উদ্ধার করতে হবে। নইলে এই কন্‌কনে ঠান্ডায় ওর ভেতর পড়ে থেকে এখুনি ওটা মারা যাবে। এই ভেবে সে কেনারামের দিকে তেড়ে গিয়ে বলে, 'আমার কুকুরকে আগে তুইলে দাও, লইলে আমি রসাতল কান্ড কইরবো___এই তুমায় আমি বুলে রাইখ্‌চি।'

'আমার দায় পইড়েছে তুর কুকুর তুইলতে। উ শালো মরুক উই পাঁকের ভিতর। হারামজাদ্ আমার বাড়ি আর আমাকেই বাড়ি ঢুইকতে দেয় না! উর এমোন আসপোদ্দা!' কথাগুলো বলতে বলতে কেনারাম যেন খুব বীরপুরুষের মতো কাজ করেছে এমনি একটা ভাব নিয়ে নিজের ওভারকোটের পেছনে হাতদুটো মুছতে মুছতে দাওয়ায় গিয়ে ওঠে। তারপর ঢোকে ঘরে।

উঠোনভর্তি পড়শীর সামনে কেনারামের এই 'ব্যাভার' আহ্লাদির মনে অপমানের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সে সেখানে দাঁড়িয়েই কেনারামকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'আম্মো সহয়ারামের বিটি, কারও মিজাজের তুয়াক্কা করি না। এই থাইকলো তুমার ঘর-সমসার, আমি চইললাম বাপের ভিটায়। একটো বিহিত কইরে তবে ছাইড়বো।' বলে দুম দুম করে পা ফেলে এই পাড়ারই আরেক মুড়োয় তার বাপের বাড়ির দিকে চলে যায়। আর নসু বেকুবের মতো খানিকক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে একবার ঘরের দিকে তাকায়, একবার উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা পাড়ার লোকজনদের দিকে চায়, বোধহয় এমন একটা পরিস্থিতিতে সে কী করবে___অর্থাৎ বাপের দিকে যাবে না মায়ের পেছু নেবে___এইটাই সে ভাবতে থাকে, তারপর হঠাৎই মুখে 'কু-ঝিক্‌ঝিক' আওয়াজ তুলে আর দুটো হাত এঞ্জিনের পিস্টনের ভঙ্গীতে নাড়াতে নাড়াতে মায়ের দিকে দৌড় দেয়।

কেনারামের জ্যাঠতুতো ভাই বনোয়ারীলাল এবার ঘরে ঢুকে কেনারামকে বলে, 'হ্যাঁ রে কিনি, ইটা তু কী কইরলি বুল দিখিনি। এতোদিন পরে বাড়িতে এইসে কুথায় বউ-বিটা লিয়ে সাঁধ-আল্লাদ কইরবি, তা লয়, বউটোকে রাগায় দিয়ে তাকে তু বাপের ঘরে পাঠায় দিলি।'

'বেশ কইরেচি, যাক্___উ শালী বাপের ঘরেই পইড়ে থাক। আম্মো শালা টাউনে থেইকে যাবো। তেমোন বুইঝলে সিখানকেই আবার ঘর সমসার কইরবো।' কেনারাম রাগে গরগর করতে করতে কথাগুলো বলে।

বনোয়ারীলাল বোঝে, এটা কিনি-র রাগের কথা। রাগ পড়লেই আবার যে কে সেই। আহ্লাদিকে ধরে আনার জন্যে তখন দশবার

করে শ্বশুরবাড়ি ছুটো-ছুটি করবে। দরকার পড়লে বউয়ের পায়ে মাথা কুটবে। কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন কুকুরটার কী উপায় হবে? ওটাকে যে এখুনি পাঁক থেকে টেনে না তুললে বেঘোরে মারা যাবে। এসব কথা ভেবে বনোয়ারীলাল এবার বলে, কিন্তু কুকুরটো যে উখানে পইড়ে থাইক্‌লে মইরে যাবে।'

'যাক, উ শালো যার কুকুর সে বুইঝবে। আর তুর যদি ওতো দরদ থাকে তবে তু তুলগা।'

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত বনোয়ারীলালই তোলে কুকুরটাকে। পাঁকে গেঁথে থাকা অবস্থায় খানিকক্ষণ হাঁস ফাঁস করে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল কালু। তাই উদ্ধার পাবার পর উঠোনের পেয়ারাগানের নীচে সেই যে ঝিম মেরে এসে শুয়ে পড়ে তারপর বড়ো একটা নড়াচড়া করে না। একেকবার শুধু আহ্লাদির দেখা পাবে মনে করে চোখ খুলে ঘরের দিকে চায়।

এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদে বাড়লে কী খাবে, কোথায় যাবে এসব চিন্তা এসে পাক খায় কেনারামের মাথায়। যদিও রান্না করার অভ্যেস আছে, কিন্তু বাড়ি এসে নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে খাবে এসব কথা ভাবতেও তার খারাপ লাগে। তাই বাজার থেকে চিঁড়ে মুড়ি কিনে এনে তাই খেয়েই সে সকাল আর দুপুরটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেয়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে সে যখন দাওয়ার মিঠে রোদ্দুরে চ্যাটাইটা বিছিয়ে শুয়েছে এবং চোখে একটু ঘুম-ঘুম ভাবও এসেছে, ঠিক সেই সময় মাথার কাছে নসুর গলায় 'ও বাপ-বাপ' ডাক শুনে চট্‌কাটা তার ছুটে যায়। বালিশে মাথা রেখেই সে ঘুমজড়ানো চোখে নসুর দিকে চেয়ে বলে ওঠে, 'কী হইয়েচে নসু?'

'আমাকে ছারকাছ দেখাইতে লিয়ে যাবে?'

'কুথায় ছারকাছ?'

'উই দরগার মেলায় এইসেচে।'

'হাঁ হাঁ যাবো লিচ্চয় যাবো, কিন্তু সি তো এখনো দেরী আছে বাপ। এট্টু ঘুম্মে লি। লে লে তুও ঘুমা।' বলে গায়ে দেওয়া কাঁথাটা একটু তুলে ধরে তার ভেতর নসুকে ঢুকে পড়তে বলে। নসু কাঁথার ভেতরে ঢুকলে কেনারাম তাকে বলে, 'তু যে ইখানকে এইসেচিস তুর মা জানে?'

'না, মাকে লুকায় এইসেচি।' নসু হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

কেনারাম বলে, 'ভালো কইরেচিস। লে এখোন ঘুমায়ে লে। সনঝেবেলায় তুকে লিয়ে ছারকাছ দেইখতে যাবো। মেলায় যে জিলিপি খাবো, বঁয়দে খাবো, আরো কোতো কি খাবো।'

'ঠিক বইলচো?'

'হাঁ রে হাঁ, ঠিক বুইল্‌চি। কিন্তুক তু আর মামুর ঘরকে যাবি না।' 'মা আমায় খুঁইজতে আইসলে?'

'আসুক না কেনে, আমি তুকে যেইতে দিব না। তুকে লিয়ে আমি টাউনে যাবো। সিখানে দেইখবি কোতো মজা, কোতো ছারকাছ, কোতো বাঁইসকোপ।'

'ঠিক বইলচো?'

'হাঁ রে হাঁ ঠিক, তু দেখিস না কেনে।'

'মা যদি যেইতে না দেয়?'

'তুর মায়ের আমি লিকুচি করি। তু আমার বিটা, যিখানকে খুশী আমি তুকে লিয়ে যাবো।' একটু থেমে কী যেন চিন্তা করে কেনারাম আবার বলে, 'কিন্তুক তু মায়ের লেইগে কান্‌বি না তো?'

'না।'

কেনারাম ছেলের পিঠ চাপড়ে বলে, 'সাবাস বিটা! ঠিক হায়, বাপকা বিটা সিপাইকা ঘোড়া। লে ইবার ঘুম্মে পড়।' বলে সে যেন খুব খুশী আর নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের চোখদুটো বন্ধ করে।

বিকেলে কেনারাম নসুর গায়ে সেই রঙচঙে সোয়েটারটা পরিয়ে আর নিজে ওভারকোট আর টুপিটা পরে রেললাইনের ওপারে দরগার মেলার দিকে এগোয়। তারপর বাপবেটায় সার্কাস দেখে আর মেলার একটা দোকানে বসে পেট ভরে ঘুগনি, পাউরুটি, জিলিপি, বোঁদে খেয়ে অনেক রাত্তিরে যখন বাড়ি ফেরে তখন তার শেকল খোলার শব্দ পেয়ে পাশের বাড়ি থেকে বনোয়ারীলাল জিগ্যেস করে, 'কে বটে? কিনি নাকি রে?'

'হাঁ, কেনে?' কেনারাম উৎসুক হয়ে জানতে চায়।

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বনোয়ারী প্রশ্ন করে, 'নসু কুথায়? তাকে লিয়ে তু কুথায় যেইছিলি? উঁর মা যে উকে খুঁইজতে এর্সছিলো!'

'তা তু কী বললি উকে?'

'আমি তো জানি না নসু কুথায়, তাই বইল্‌লাম, দেখ বাপের সইঙ্গেই কুথায় বেড়াইতে যেছে।'

'কেনে তু উ কথা বইল্‌লি কেনে? তু দেখেছিস আমার সইঙ্গে বেড়াইতে যেছে?'

বনোয়ারী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দেয়, 'না দেখি নাই, তবে তুর ঘরে তালা ঝুইল্‌তে দেখে আন্‌জাত কইরে বুলেচি। দেখ্‌, এখুনি আবার ছেইলের খোঁজে উ এইসে পইড়বে।'

কথাটা শুনে নসু বাপের হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, 'মা যদি এইসে পড়ে তখন কী হবে বাপ?'

চাপাগলায় কেনারাম বলে, 'তু ঘরে যেয়ে চুপ মেইরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড় দিকি। এইলে আমি বুইঝবো। যা যা শুয়ে পড়, আর দেরি কইরবি না।' বলে সে নিজেই ঘরের চৌকিতে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে দরজাটা ভালো ক'রে টেনে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়।

বাইরে জ্যোৎস্নাটা যেন আজ ধুলো মেখে রয়েছে। শীতটাও অন্যদিনের থেকে একটু কম। থেকে থেকে এমন ফুরফুরে একটা হাওয়া দিচ্ছে যাতে হোলির সময়কার রাতের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। এখন কেনারামের মনেও যেন এইরকম একটা ফুরফুরে হাওয়া, ধুলো ওড়া জ্যোৎস্নার খেলা। প্যাঁচে ফেলে আহ্লাদিকে যে সে এমন ছুটোছুটি করাতে পেরেছে, এমনকি বাড়ি অব্দি টেনে আনতে পেরেছে—এতেই সে খুশী। তাছাড়া নসুর খোঁজে ও আবার এখুনি ছুটে আসবে এইরকম একটা বিশ্বাসও তার এই খুশীর মূলে রয়েছে। ওভারকোটের পকেট থেকে আধপোড়া একটা চুরুট বের ক'রে সেটা ধরায়। তারপর দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে পায়চারী করতে থাকে।

এবেলা কুকুরটার আর পাত্তা নেই। দুপুর পর্যন্ত ঝিম্ মেরে সে পেয়ারা গাছটার তলায় শুয়ে ছিল। তারপর চাঙ্গা হয়ে, আর বোধহয় সকাল থেকে এবাড়িতে তার মনিবানির ছায়া না দেখে এখান থেকে পাত্‌তাড়ি গুটিয়েছে।

যাই হোক, ও গেছে তাই রক্ষে। তাই কেনারাম নিশ্চিন্তে গায়ে ওভারকোট আর মাথায় টুপি চাপিয়ে উঠোনে এমন পায়চারী করতে পারছে। চুরুট মুখে কায়দা ক'রে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে কখনো তার টাউনের সেই রায় সাহেবের মতো মনে হচ্ছে, কখনো বা বাইসকোপে দেখা সেই বাহাদুরটার মতো।

এই পোশাকে জ্যোৎস্নার ভেতর এভাবে পায়চারি করা, আর একজনের প্রতীক্ষায় থাকা___এ দুটোই যেন কেনারামকে খানিকটা অভিভূত করে রেখেছিল। তাই চুরুটটা শেষ হয়ে যাবার পরও একনাগাড়ে উঠোনে সে তেমনি পায়চারি করতে থাকে।

এবং শেষ পর্যন্ত তার এই প্রতীক্ষায় থাকা সফল হয়। মরা জ্যোৎস্নার ভেতর একসময় সে দেখতে পায়, ডোবাটার পাড় ঘেঁষে কারা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। ছাপছোপ রঙীন শাড়ি পরাটা যে আহ্লাদি তা ওর কোমর দোলানো আর পা ফেলার ধরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওর পেছনে শাদা শাড়ি পরা ওটা আবার কে?

কে সেটা কেনারাম ভালো করে বোঝারই সুযোগ পায় না। কেননা উঠোনটায় পা দেবার আগেই সে কেনারামের পোশাক-আশাক আর পায়চারি করার ধরন দেখে খানিকটা অবাক হওয়ার সুরে 'অ মা গো!' বলে খিলখিল করে হেসে আহ্লাদির পিঠে একটা কিল বসিয়ে ছুট দেয়।

পেয়ারা গাছটার নীচে কেমন যেন গুম মেরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আহ্লাদি এবার থমথমে গলায় প্রশ্ন করে, 'নসু

কুথায়?'

'নসু কুথায় তা আমি কেমন কইরে বইলবো! সি তো বিহান বেলায় তুর পাছু পাছু ছুট দিল।' কেনারাম বেশ গমগমে গলায় জবাব দেয়।

'না, নসু আবার দুপুর বেলায় ইখানে এইসেচে।'

'কে তুকে ই কথা বইল্‌লো? উ আসে নাই ইখানে।'

'হাঁ এইসেচে।' আহ্লাদি জোর দিয়ে কথাটা বলে এবার ঘরের দিকে এগোতে গেলে কেনারাম তার সামনে এবার হুমকে দাঁড়ায়, 'তু কুথা যাচ্ছিস!'

'নসু ঘরে আছে কিনা আমি দেইখ্‌তে যাচ্ছি।'

'না নসু ঘরে নাই। তু আমার ঘরে ঢুকবি না। যে মেইয়েছেলে ত্যাজ দেখায়ে বাড়ি থেকে চইলে যায় তাকে আমি ঘরে ঢুইক্‌তে দিব না। আর নসুকেও আমি তুর কাছকে যেতে দিব না। হঁ জানবি আমার নাম কিনারাম। এ দুনিয়ামে কোইকো শালা হাম পরোয়া নেহি করতা।' বলে ওভারকোট ঢাকা বুকে জোরে একটা কিল বসায়।

'আ মরণ!' বলে ফিক করে হেসে কেনারামকে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে আর থাবড়া মেরে তার মাথার টুপিটা ফেলে আহ্লাদি দাওয়ায় উঠতে যায়। কিন্তু কেনারাম তার আগেই হ্যাঁচকা টানে তাঁকে বুকের ওপর নিয়ে বলে, 'শালী আজ তুকে আমি পিষে মেইরে ফেইলবো।'

'তাই মারো না কেনে। আম্মো তো তবে বেঁইচে যাই।'

'হাঁ হাঁ, ভালো কইরেই তুকে বাঁচাবো।' বলে কেনারাম এবার বুঝি সত্যি সত্যিই আহ্লাদিকে তার বুকের ওপর পিষে মারতে চায়।

আর ঠিক সেই সময় উঠোনে ছড়িয়ে থাকা শুকনো পেয়ারাপাতার ওপর খসখস শব্দ শুনে ওরা দুজনেই চমকে উঠে পেছন ফিরে দ্যাখে, কালু এসে পেয়ারা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছে। কুকুরটার দিকে চেয়ে থেকে কেনারাম ভয়ে ভয়ে বলে, 'ই শালা ফির না হুজ্জত বাধায়!'

'না, উ আর কিছু কইরবে না।' আহ্লাদি হাসতে হাসতে অভয় দেয়।

কেনারাম প্রশ্ন করে, 'কেনে?'

'বেপার আছে।'

'কী বেপার?'

'আমি ওতো বইলতে লারবো, তুমি দেখ না কেনে!' আহ্লাদি এবার লাজুক সুরে কথাটা বলে। কেনারাম কুকুরটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, সত্যি সত্যি ও একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জুলজুলে চোখে এমনভাবে তাদের এই জড়াজড়ির ব্যাপারটা দেখছে, যার মানে করলে এই রকমই দাঁড়ায়,——খোদ মণিবানিই যদি সকালের সেই বিতিকিচ্ছিরি পোশাকের মানুষটাকে এভাবে আশ্‌কারা দেয় তাহলে তার আর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যাওয়ার দরকারটা কী? □

শনিবারের চিঠি

বিজ্ঞাপনের হার

	স্বাভাবিক হার	চুক্তি অনুসারে হার
এক পাতা	২,০০০/-	১,৮০০/-
আধ পাতা	১,২০০/-	১,০০০/-
১/৪ পাতা	৭৫০/-	৬০০/-
এক কলাম	৭৫০/-	৬০০/-
১/২ কলাম	৪০০/-	৩৫০/-
চতুর্থ মলাট (চার রঙ)	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
ভেতরের দ্বিতীয় মলাট (সাদা কালো)	২,৫০০/-	২,২০০/-

রঙীন বিজ্ঞাপনের জন্য ঃ–

ভেতরের পাতায় প্রতিটির জন্য ১০০% অতিরিক্ত। ট্রান্সপারেনসি গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি অতিরিক্ত ট্রান্সপারেনসির জন্য ৫০০ টাকা বেশি

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য:

- শনিবারের চিঠির চাঁদার হার সডাক বার্ষিক একশো টাকা, ষান্মাসিক পঞ্চাশ টাকা, ত্রৈমাসিক পঁচিশ টাকা।
- চাঁদা নগদে, মনি-অর্ডারে, ড্রাফ্‌টে বা কলকাতার ব্যাঙ্কে চেক মারফত দেওয়া চলবে।
- যে কোনও সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে।
- ভি. পি. তে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
- অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য সাক্ষাতে বা চিঠি লিখে জানালে বিবেচনা করা হবে।

এজেন্টদের জন্য:

- কলকাতার বাইরে যে কোনও জায়গায় এজেন্সি দিতে আমরা ইচ্ছুক।
- এজেন্টরা চিঠি লিখলে আমাদের ছাপানো নিয়মাবলী পাঠানো হবে।

ধারাবাহিক

মরজি মহল

বনফুল

।। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

ধূমধাম আড়ম্বর
এ তো শুধু আত্মবিজ্ঞাপন
একাগ্র সাধনা ছাড়া
হয় না তো শক্তির বোধন
ঝুঁটি আর টুঁটি ধরে
বুকে আজ বসছে শমন
সত্য শক্তি সাধনায়
অবিলম্বে কর প্রাণপণ।

বাঙালীরা অধিকাংশই বেকার। মানে সংসার প্রতিপালনের জন্য যে সব কাজ করা উচিত তা তারা করে না। করবার সামর্থ্য নেই অনেকের। অনেকের সুযোগ নেই। কিন্তু মন তো নিস্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই তারা দলে দলে লেখক হয়, সংস্কৃতি-সভার ওজুহাতে আত্মআস্ফালন করে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়, মনোমত রক পেলে রকবাজী করে। এই বেকারের দলকে যদি গভর্ণমেন্ট কাজ দিতে না পারে তাহলে ভবিষ্যৎ অগ্নিগর্ভ। আর ভবিষ্যতে যে আগুন জ্বলবে এরাই হবে তার ইন্ধন।

।। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছেন যে তাঁকে হুমকি দেখিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে অনেকে চিঠি লিখেছেন। সে সব চিঠিতে বলেছেন তোমারও মুজিবর রহমানের দশা হবে। ফোর্ডের উপর গুলি চলছে। তুমিও রেহাই পাবে না। ইন্দিরাজী জানিয়েছেন তিনি এসবে ভয় পান না। ভয় পান না হয়ত কিন্তু বিব্রত বোধ করেন নিশ্চয়ই Uneasy lies the head that wears a crown—এটা অতি প্রাচীন প্রবাদ। আজকাল মাথায় মুকুট পরার রেওয়াজ নেই, আজকালকার মুকুট অদৃশ্য মুকুট। বিব্রতভাবটা কিন্তু অদৃশ্য হয় নি আজও।

ইন্দিরাজী বলেছেন—Emergency এখন উঠবে না, কারণ ওতে সুফল ফলেছে।

যতদিন দেশে থাকবে পাগলা কুকুর ততদিন উদ্যত থাকবে এই মুগুর।

।। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

আমাদের দেশের নূতন লেখকরা
বড় অসহায়
শ্যাওলার মতো ভেসে ভেসে বেড়ায়
ঘাটে ঘাটে
কোথাও শিকড় গাড়তে পারে না।
কেউ তাদের লেখা পড়ে দেখে না
কোথাও সে সব লেখা প্রকাশিত হয় না।
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে
তাই কেউ হয়েছে অশ্লীল
কেউ হাস্যকর ঢং করছে নানারকম,
প্রলাপ বকছে কেউ কেউ
অসংলগ্ন অর্থহীন ভাষায়
উদ্দেশ্য—আমাদের দিকে দেখ।
কেউ দেখছে না।
অসংখ্য ছোট ছোট কাগজ বেরুচ্ছে
কেউ পড়ছে না।
ওগো মা সরস্বতী,
তুমিও কি এদের দিকে ফিরে চাইবে না?
অসংখ্য ফুল ফুটছে আর ঝরছে
ঝরা ফুলের ঝরণা বইছে না কিন্তু
কারণ ওরা ঝরা মরা, জীবন্ত বেগবান নয়।

আজ বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। এক স্মরণ-সভায় গিয়েছিলাম। আমরা এখনও অমানুষ হইনি। বৎসরান্তেও একবার ওঁকে স্মরণ করি তো।

।। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

পূজো-পূজো ভাব আজ
চারদিকে ফুটেছে
ওই যে সোনার রোদ উঠেছে
নীলকণ্ঠরা সব ঘোরা ফেরা করছে
দু'একটা খঞ্জনও জুটেছে।
শুভ্র মেঘের স্তূপ নীলাকাশে ভাসছে
কাশ ফুল নদীতীরে হাসছে
কাপড় কেনার ধূম দোকানেও দোকানে
ছেলেমেয়ে যাচ্ছে ও আসছে।
কুমোরেরা বিনিদ্র উৎসুক
অনুপম হাওয়া চাই মার মুখ
শরতের ছোঁয়া-লেগে আনন্দ ওঠে জেগে
সারা দেশ আজ যেন উন্মুখ।

আজ আমার বেহাই তুলসীবাবুর আদ্য শ্রাদ্ধ। একটু পরেই সেখানে যাব। সফর করতে ভালবাসতেন বেহাই। যখন তখন কাশী, কার্শিয়ং, পুরী, দার্জিলিং চলে যেতেন। কয়েকদিন পরেই ফিরে আসতেন। এই শেষ সফর থেকে আর তিনি ফিরবেন না। আজ তাঁর আদ্য শ্রাদ্ধ। একটু পরে যাব সেখানে।
সেখানে গিয়ে দেখব যা
চিরকালই দেখছি তা
ব্যস্ত সবাই নানান আয়োজনেই
যাকে নিয়ে এত কান্ড সেই কেবলই নেই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, বিরহিণী ঘুঘুপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সভাটি শিহরিয়া উঠিল; এবং অসমাপ্ত 'ঘুঘু' ও অপঠিত 'ঘোল' লইয়া টুনটুনি মন্ডল মঞ্চাবতরণ না কর পর্য্যন্ত সেই প্রচন্ড শিহরণ থামিল না। অনেকে অস্ফুটকন্ঠে মন্তব্য করিলেন, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।

সভাপতি মহাশয় হাঁকিলেন, অচলানন্দ গোস্বামী মহাশয়কে আমি কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি।

অচলানন্দ ঈষদ্ধাস্যে গাত্রোত্থান করিলেন।

অচলানন্দের শরীরে কিঞ্চিৎ মেদ আছে এবং মুখে আছে আবক্ষলম্বিত দাড়ি। কাঁধে চাদর ঝুলাইয়া চেহারাটিকে ঋষিজনোচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পুরু ঠোঁট দুইটা কেবল দাড়ির জঙ্গল ভেদ করিয়া সে সাধে বাদ সাধিবার চেষ্টা করিতেছে। ঠোঁটের অবাধ্যতায় গোস্বামী প্রভু ব্যতিব্যস্ত হইয়া মুখের হাসিটিকে পাকা করিয়া রাখিয়াছেন।

মঞ্চে উঠিয়া তিনি যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া সুষ্ঠু ভঙ্গিতে প্রণাম করিলেন এবং সদাহাস্যরঞ্জিত ওষ্ঠাধর চালনাকরত আরম্ভ করিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমরা এখানে এসেছি – একপ্রাণে মিলবার জন্য; এ দেশ প্রেমের দেশ। এক সময়ে প্রেমের বন্যা বয়ে গিয়েছিল এখানে। আজ সে দিন নাই। লোকের প্রাণে প্রেম নাই। এক সময়ে এখানে প্রেম যথেষ্ট ছিল, আজ সব শুকনো। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানি, এ দেশ প্রেমের দেশ, এ দেশের লোক প্রেমিক, অথচ আজ এখানে প্রেম কম।

পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল, বক্তার অন্তরে ক্রমশ প্রেমাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। বিপদগ্রস্ত বিদেশী সভাপতি সম্পাদকের মুখের পানে চাহিলেন, সম্পাদক মনান্তরের ভয়ে দৃষ্টিকে ভূমিসংলগ্ন করিলেন। ওদিকে দর্শকমধ্যে ঘন ঘন করতালি ধ্বনি উঠিল, শিশুরা সুযোগ বুঝিয়া কোলাহল জমাইল। বক্তার অন্তরে প্রেমাগ্নি তখন বর্দ্ধিত বেগে জ্বলিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় হতাশ হইয়া চারিদিকে চাহিলেন, সম্পাদক ভূমিসংলগ্ন দৃষ্টি উঠাইতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে কোলাহলের ঊর্দ্ধে কন্ঠস্বর তুলিতে গিয়া বক্তা হঠাৎ গলা ভাঙিয়া ফেলিলেন। গলা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কাসি; এবং তাহারই প্রকোপে তিনি অসম্পূর্ণ বক্তব্যসমেত পরম ক্ষুণ্নমনে মঞ্চ ত্যাগ করিলেন।

বিপন্ন সভাপতি মহাশয় সম্পাদকের কানে কানে অনুচ্চকন্ঠে কহিলেন, এতগুলি লোকের বক্তৃতা আর নাই হ'ল! কিছু বাদ দিয়ে দিন, যেহেতু সময়ের জ্ঞান ওঁদের বড় কম।

সম্পাদক বলিলেন, আশুতোষ সাহাকে আহ্বান করতেই হবে। উনি চিরকালই গোস্বামী প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী। ওঁকে বলবার সুযোগ না দিলে অনর্থপাত হবে। আর যাঁকে বাদ দেন, দেবেন।

সভাপতি মহাশয় কোলাহল থামিতে না থামিতে তেমনই অনুচ্চকন্ঠে ডাকিলেন, আশুতোষ সাহা মহাশয়কে কিছু বলতে অনুরোধ করি।

সভাপতি মহাশয়ের হিসাবে কিন্তু ভুল হইয়াছিল। কোলাহলের মধ্যে নিম্নকন্ঠে আহ্বান করিলে হয়তো তালিকাভুক্ত বক্তার কর্ণে সে ধ্বনি পৌঁছিবে না এই আশায় তিনি বুক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু হায়! সাধারণ শ্রোতার শ্রবণশক্তির চেয়েও বক্তার শ্রবণশক্তি যে কত তীক্ষ্ণ তাহা আহ্বানকারী কয়জন বোঝেন? বক্তৃতা করিবার আগে অধিকাংশ বক্তার কান যেমন সভাপতির মৃদুতম আহ্বান গ্রহণ করিবার জন্যে অতিরিক্তি মাত্রায় সজাগ হইয়া থাকে, মঞ্চে উঠিবার পর সেই সজাগ ভাব যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। শ্রোতৃবৃন্দের বিরক্তি গুঞ্জনেও তখন তাঁহার বধিরতা কাটে না।

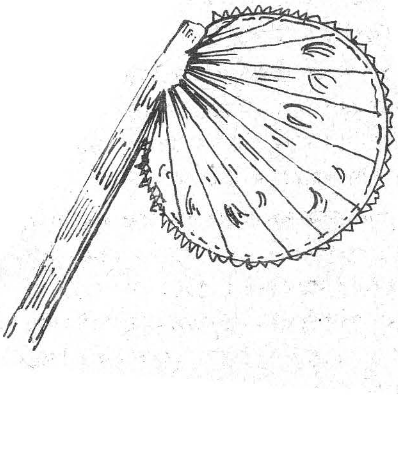

যাহা হউক, আশুতোষ বিরাট বপু উত্তোলনকরত মঞ্চে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, সক্ষম হইলেন না। অগত্যা সভাপতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, কেউ দাড়ি নিয়ে বক্তৃতা করেন, কেউ করেন দাড়ি কামিয়ে (বলা বাহুল্য, ইহার দাড়ি ছিল না)। আসল কথা – দাড়ি থাক, আর নাই থাক, বক্তৃতা তাঁদের করতেই হয়। বলব কি মশায়, আজ ছমাস হ'ল আমি বেরিবেরিতে ভুগছি, ওই ডাক্তারবাবু ব'সে আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন। কথা বলতে গেলে হাঁপ লাগে। কিন্তু আজ যে মহাত্মাকে সভাপতিরূপে আমাদের মধ্যে পেয়েছি তাঁর সামনে কিছু বলতে না পারলে তৃপ্তি নেই। এতে যদি গলা ভেঙে মুখ দিয়ে আমার রক্ত ওঠে, তবু আমি বলব ওগো ছেলেরা, তোমরা আজ কাকে এনে সভাপতি করেছ? ইনি যে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু। এঁকে সামনে রেখে কোন্ অর্ব্বাচীন বলতে পারে, এ দেশে প্রেম নাই ! যে বলে, সে একটি জগাই-মার্কা পাষন্ড। তার প্রাণ মরুভূমি। ওগো, এই দেশে প্রেম ছিল, এখনও আছে। তাই তো দয়াময় প্রেমময় ভক্তের ডাক উপেক্ষা করতে না পেরে এখানে এসে অতিথি হয়েছেন। প্রভু ওগো, তুমি বছর বছর এমনই ক'রে আমাদের প্রেম-বন্যায় ভাসিয়ে দিতে এখানে এস। তোমার পা দুটি ধ'রে বলছি –

বিব্রত সভাপতি বক্তার হাত ধরিয়া শশব্যস্তে কহিলেন, আহা করেন কি, করেন কি! বৃদ্ধ, পূজ্য আপনি, করেন কি?

অতঃপর সভাপতি অবশিষ্ট বক্তাগণকে আহ্বান না করিয়াই আপন বক্তব্য আরম্ভ করিলেন।

সভা শেষে আশুতোষ সাহা সভাপতির করকমলে আপনার বহুবর্ষ পূর্ব্বের রচিত কয়েকখানি পুস্তিকা ও এক তাড়া সাদা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, আমার বইগুলো আপনার করে ভক্তি-উপহার দিলাম। কাগজটাতে একটা গল্প আছে, আপনার পত্রিকাতে ছাপাবেন।

গল্প ছাড়িয়া সত্য ঘটনাতে ফিরিয়া আসা যাক। কিন্তু সত্য ঘটনাকে রং দিয়া ঘোরালো করা আমার সাধ্য-অনায়ত্ত। কাজেই তালবৃন্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুঘুর ডাক শুনিতে লাগিলাম। □

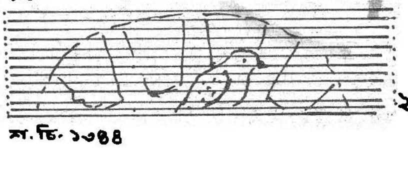

টরা-ইয়ানি

বাসুদেব বসু

এক এক অরণ্যে আমার মনে এক এক ধরণের বিশেষ অনুভূতি জেগে ওঠে। অরুণাচলের অরণ্যে যে অনুভূতি সে কি আর উড়িষ্যার কালাহান্ডি অরণ্যে মিলবে। ছোটনাগপুরের অরণ্যের সঙ্গে ডুয়ার্সের অরণ্যের অনেক তফাত। উড়িষ্যার বোলাঙগীর আর সুন্দরগড়ের অরণ্যের সঙ্গে হাজারিবাগের অরণ্যের প্রভেদ রয়েছে বৈকি। আবার মধ্যপ্রদেশের অরণ্যের সঙ্গে নাগাভূমির অরণ্যের অনেক ফারাক। প্রতিটি অরণ্য তার নিজস্ব রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে পৃথক রূপে ধরা দেয়।

পাঠককে নেফা বা অরুণাচল অরণ্য অঞ্চলের এক আদিবাসীর রসঘন অথচ করুণ প্রেমকাহিনী শোনাচ্ছি।

প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। অরুণাচল প্রদেশ তখনও নেফা বলে পরিচিত। নেফা জুড়ে তখন শুধু পাহাড়, জঙ্গল আর নদী। স্বাধীনতার আগে বৃটিশ আমলে এ এক লুক্কায়িত দেশ বা Hidden Land বলে পরিচিত ছিলো। বৃটিশ সরকার এর উন্নতিকল্পে কিছুই করেনি। ভারত স্বাধীন হবার পরও এর সভ্যতার পথে অগ্রগতি ছিলো খুব মন্থর। চীনা সৈন্যদের নেফা আক্রমণের পর থেকেই দেশবাসীর চোখ পড়ে নেফার ওপর এবং তার পর থেকেই নেফা উন্নতির পথে জোর কদমে পা ফেলা শুরু করে।

যাক এবার গল্প শুরু করি। নেফার সিয়াং ডিভিসানে রটুং প্রান্তরে মেলা বসেছে। এ মেলা আমাদের দেশের মেলা নয়। এ মেলায় বাউল একতারা বাজিয়ে গান করে না। রামায়ণের পট দেখিয়ে গ্রামের পটুয়া গান ধরে না। নাগরদোলায় পাক লাগায় না কেউ। মাটির ভাঁড়ে চায়ে চুমুক দেয় না। রঙীন মালা সাজিয়ে বসেনি কোনো পসারিণী। নেই গুড়ের হাঁড়ি। নেই মাটির কলসী, পোড়া মাটির পুতুলের রাশি নেই। কাঁচের ফুলদানী বা চামড়ার তৈরি জিনিসপত্র নেই। আর নেই তেলেভাজা পাঁপড়। কীর্তনীয়ার খোল নেই। যাত্রার পালাগান নেই। নেই আতসবাজির রোশনাই। আর নেই ফুলঝুরি। কোথায় পাওয়া যাবে কাঁচাগোল্লা, সরভাজা, মোয়া আর পাটালি গুড়ের সন্দেশ। মেলার প্রান্তরে নেই কবিগান। যাত্রা নেই, সার্কাস নেই। কবির লড়াই-এর অভাব রয়েছে।

এখানকার মেলার ছবিটা কিন্তু অন্যরকম। শুঁটকি মাছ, সাপের, শূকরের, কাঠবিড়ালীর আর গিরগিটির পোড়া মাংসের গন্ধ সারাটা তল্লাট আমোদ করেছে। এখানকার লোকগুলোর ভেতর কেউ জড়িয়েছে ভালুক বা চিতা বাঘের ছাল। কেউ আচ্ছাদিত করেছে নিজেকে বৃক্ষ বল্কলে। কেউ বা স্রেফ ঘাস, দুর্বা বা লতাপাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে। ওরা পশুপাখীর দাঁত, নখ, ঠোঁট, চামড়া নিয়ে বসেছে। চলেছে ঝাড়ফুঁক। তন্ত্রমন্ত্র। গাছের শিকড়বাকড় বেঁটে গিরগিটির সেদ্ধ পাকস্থলীর সঙ্গে মিলিয়ে চিকিৎসা চলেছে। বন্য কুকুর বা শেয়ালের কামড়ে আহত রোগী চেঁচাচ্ছে। জল দেখে আতঙ্কিত হয়ে হাত পা ছুঁড়ছে। খিঁচুনি বাড়ছে ক্রমশ। পিরকু পিনুটে অপদেবতাকে খুশি করবার জন্যে চলেছে মুখোশ নৃত্য। গলগন্ড বা গয়টার রোগে আক্রান্ত অসংখ্য রোগী।

গলগন্ড রোগের তীব্র প্রকোপে হয়েছে বধির। এছাড়া রয়েছে মারাত্মক ধরণের সিফিলিস, চর্মরোগ, যক্ষা আর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত সব রোগী। সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে ওঝা আর গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার। শিকড়বাকড়ের পাহাড় সাজিয়ে বসেছে ওরা। গন্ডারের শিং চূর্ণ করে, ওরই প্রস্রাব, মধু আর নানারকম গাছগাছড়ার সংমিশ্রণে তৈরি করেছে অব্যর্থ ওষুধ। পিশাচসিদ্ধ পুরুষ মুখে হাতে পায়ে উল্কী কেটে নিজেকে যতটা সম্ভব কিম্ভূতাকার বানিয়ে নখদর্পণে ভূত ভবিষ্যত বলে চলেছে। মাটিতে ধূলোর ওপর রেখা আর গন্ডী টেনে মন্ত্র আওড়াচ্ছে কেউ কেউ। কোনোখানে বিক্রী হচ্ছে প্যান্থার। লেপার্ড আর হরিণের চামড়া, গিরগিটির মাংস, হাড়, মজ্জা পুড়িয়ে তার তেলে কেউ দরদ সারাচ্ছে। বেদনা বিষের উপশম করছে। নেশায় লোকগুলো টং হয়ে রয়েছে। আপঙ (দিশী মদ)-এর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। গাঁজা টানছে কেউ কেউ। আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে অনেকে পড়ে রয়েছে। বিরাট বিরাট গাছগুলোর তলায় তলায় সমবেত লোকগুলো আমোদ আহ্লাদে মাতোয়ারা। পোকা খাওয়া দাঁত। মঙ্গোলিয়ান ফিচার্স। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। তাম্বুলে রঞ্জিত ওষ্ঠাধর। মেয়েদের পিঠে বাঁধা ঝুড়ির ভেতর থেকে খুদে খুদে মানব সন্তান উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মিনিয়ঙ, পদম, পাশি, পাঙিগ, সিমঙগ, বরি, আশিঙ আর টাঙগাম ট্রাইবের লোকগুলো মেলায় এসে উৎসবে মেতেছে। মেলায় আসবার আগে মিয়োন (ষাঁড়ের মত দেখতে একরকম জন্তু) কেটে তার রক্ত ওরা সিয়াং নদীর জলে ঢেলেছে। দেবতা ডইনিপোলোর উদ্দেশ্যে মাংস উৎসর্গ করেছে। বলেছে – "তুমি সব দেখতে পাও। রাত এবং দিন, সব সময় তোমার সতর্ক চক্ষু আমাদের পাহারা দিচ্ছে। তুমি আমাদের ভালো কাজটা মনে রেখো। মন্দ কাজ দেখতে পেলেও ভুলে যেয়ো। ক্ষমা করো আমাদের।" তারা মিয়োনের রক্ত আপঙ (দিশী মদ)-এর সঙ্গে মিশিয়ে ঢেলেছে শিবকরণ, সিলে, সিরকি, লিম্বুকরণ আর দুরাকরণের জলে। মৃত আত্মীয় স্বজনদের আত্মাদের ডেকে ওই জল পান করতে বলেছে। প্রার্থনা করেছে মৃত্যুর পরও যেন তাদের এরকম শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দের জীবন হয়। সিয়াং ডিভিসানের রটুং প্রান্তরে চলেছে ভালুকের নাচ, বানরের খেলা, মিয়োনের রেস, হাতীর শক্তি পরীক্ষা।

বয়ে যাচ্ছে আমোদ আর স্ফূর্তির ঢেউ। জুয়োতে মেতে উঠেছে মেয়ে পুরুষগুলো। টাকা পয়সার বদলে জিনিসপত্রের আদানপ্রদান চলেছে। নেফায় আদি ট্রাইবের লোকগুলো চিরদিনই উদ্ধত প্রকৃতির ছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৃটিশদের দ্বারা আয়োজিত সদিয়ার মেলায় ট্রাইবস্‌দের ভেতর আদিরাই সর্বশেষ যোগ দিয়েছিলো। প্রকান্ড আর জাঁদরেল ভালুকটা দু-পায়ের ওপর ভর করে নাচছে। নাচার তালে হেলছে আর দুলছে। ভালুকটা মহুয়ার রস পান করেছে। নয়তো ওকেও গেলানো হয়েছে আপঙ। ধনুকে তীর যোজনা করে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা চলেছে এদিক ওদিক। ওখানেও চলেছে জুয়ো। তীর ছুটছে শন্ শন্ শব্দ তুলে। ওই তীরের মাথায় ওরা মাখিয়ে নেয় বৃক্ষের বিষাক্ত নির্যাস। হাতী, বাঘ, অজগর কারুরই এই বিষ থেকে পরিত্রাণ নেই। রটুং প্রান্তরে জুয়োর আড্ডায় টরা ময়াংকে দেখেছিলাম। হাতী আর মিয়োনের রেসে শুকানো ধুলো উড়ছে বিস্তর। এ মেলার উদ্যোগ আর আয়োজন ট্রাইবস্-এর লোকেরাই করে থাকে। অ্যাডমিনিসট্রেশনের কর্মকর্তাদের এ মেলার বিষয়ে কিছু বলবার কইবার নেই। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে গোটা প্রান্তরটা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ কিছুদিন ধরে দেখছি রেঙিগন থেকে রটুং পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলের ভেতর রাস্তা হচ্ছে। ডিনামাইটে পাহাড়ের চাকলা খসে পড়ছে ঘন ঘন। ধোঁয়া ধুলোয় প্রান্তর ঢেকে যাচ্ছে। ডিনামাইট ফাটার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু রেঙিগনের অরণ্য কেঁপে

কেঁপে উঠছে। বুলডোজারের ঘরঘর নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিরাট মহীরুহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। সভ্যতার আলো একটু একটু করে ঢুকছে নেফার অভ্যন্তরে। নেফাকে এতো দিন পর্যন্ত হিডেন ল্যান্ড বলা হতো। শুধু সিয়াং ডিভিশানে নয়। সভ্যতা ঢুকছে কামেঙ, সুবর্ণসিরি, টিরাপ আর লোহিতে।

টরা ময়াং একটা গাছের নীচে বসে রয়েছে। সে প্রায় উলঙ্গ। একফালি ন্যাকড়া সামনে আর একফালি ন্যাকড়া পেছনে ঝুলছে। মাটি কাটা হচ্ছে আর পাহাড়ী পথে মাটি ভর্তি ঝুড়ি বহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাচ্ছে টরা ময়াং এবং তার মতো আরো অনেকে। অনেকটা সময় কাজ করবার পর টরা ময়াং এক বোঝা ক্লান্তি নিয়ে গাছতলায় বসে জিরুচ্ছে। চর্মরোগে তার সারাটা শরীর ছেয়ে গেছে। ডানদিকের চোখের ডিমটা প্রকান্ড। গর্ত থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বাঁ চোখটাকে বসন্তরোগে খেয়েছে। একটা গর্ত হাঁ হয়ে রয়েছে। গয়টারের তীব্র আক্রোশে গলাটা অসম্ভব রকম স্ফীত। টরা ময়াং-এর পিঠে একটা কুঁজ। ডান গালের ওপর থেকে কে যেন এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছিলো। মাংস নিয়ে রেখে গেছে একটা ক্ষত আর বীভৎসতা। একটা বাবলা গাছের নীচে বসে কুৎসিত আর কদাকার চেহারার টরা ময়াং পাইপ টানছে। আফিং খেয়ে সে বুঁদ হয়ে আছে। আশেপাশে অরণ্যে ডালিয়ার বর্ণবৈচিত্র্য। মাউনটেন এব নির উজ্জ্বল ছটা। লেডিজ লেসের অপূর্ব শোভা।

পূর্বজন্মের ইতিহাস অবলীলাক্রমে বলতে পারে এমন অনেক জাতিস্মরের সন্ধান পাওয়া যায়। টরা ময়াং তাদেরই একজন। টরা খুব সহজভাবেই তার পূর্বজন্মের ইতিহাস আমাকে বলেছিলো। টরা যখন মারা যায় তখন টরা ময়াং-এর বৌ-এর বয়স পনেরো। মৃত্যুর বছরখানেক পরেই টরা অন্য ঘরে জন্ম নিলো। অন্য ঘরে জন্ম নিলে কি হয়, পূর্বজন্মের সব কিছু টরার মনে রয়েছে। আগের জন্মের সমস্ত খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। তার বউ থাকে মেবো গ্রামে। বউ-এর বয়স এখন সাঁইত্রিশ আর তার বিশ। বউ এখন অন্যের হেফাজতে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম – "তুমি মেবো গ্রামে গিয়েছিলে?"

– "যাবো না কেন। আমার বউ। দাবী করবো না তাকে! আমি না হয় মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিয়েছি। কিন্তু সব কিছু আমার মনে রয়েছে। তাই চলে গেলাম মেবো গ্রামে। যেখানে আমার বউ রয়েছে।" টরা ময়াং ভাঙা ভাঙা হিন্দী আর অসমীয়া ভাষায় মিলিয়ে কথা বলছিলো।

– "কি বললে তুমি?"

– "কর্তাকে বললাম বউটা আমার। যুদ্ধে আমি প্রাণ হারিয়েছি সে কথা সত্যি। কিন্তু আবার আমি জন্ম নিয়েছি। নতুন মানুষ হয়ে আমার বউ আমি ফেরত নিতে এসেছি।"

– "বউ এতোদিনে তোমার চাইতে বয়সে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।" বলি আমি।

– "তাতে কি হয়েছে। তবু তো আমার আগের জন্মের বউ। তাছাড়া বউটা এখন যার কাছে রয়েছে, যার হেপাজতে রয়েছে সে বউটার চাইতে বয়সে ছোট।" বলে টরা।

"তা যাক। বউয়ের স্বামী কি বললে?" আমি প্রশ্ন করি।

– "লোকটা বউ-এর স্বামী হতে যাবে কোন দুঃখে। ওকে সাদি করেছে নাকি যে মেয়েটো ওর বউ বনে যাবে! তাছাড়া লোকটার এমনিতে তিনটে বিয়ে করা বউ রয়েছে। লোকটা যুদ্ধে জিতেছিলো আর তাইতে পেয়েছিলো কয়েকটা দাস আর দাসী। ক্রীতদাসী হয়ে রইলো আমার বউটা।" আমার চট করে মনে পড়লো নেফাতে এক সময় দাসপ্রথা চালু ছিলো। এক গ্রামের ট্রাইবলসরা অতর্কিতে অন্য গ্রাম আক্রমণ করে। লুটপাট করে এক দঙ্গল দাসদাসী নিয়ে ফিরতো। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর ভেরিয়ার অ্যালুইন সাহেবের মতে নেফা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ১৯৬২ সালে তিন হাজার দাসকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি দিয়েছিলো। আমি নেফাতে পৌঁছেছিলাম ১৯৬৬ সালে। ধীরে ধীরে এ প্রথা লোপ পাচ্ছিলো। যাক। পুরোনো কথায় ফিরে আসছি।

– "তা তোমার বউয়ের কর্তা তোমার কথাবার্তা শুনে কি বললে?" আমার প্রশ্ন।

– "বউটার কর্তা হেসে মাটিতে গড়াগড়ি খেলে। বললে – 'তুই ধাপ্পা দেবার জায়গা পেলিনে। এখানে এলি ভাঁওতা দিতে। প্রমাণ কি যে তুই ওর আগের পক্ষের স্বামী।' – 'আমি প্রমাণ দিলাম। বউটার ভাইয়ের নাম বললাম। পাঙিগনে থাকে তা বললাম। বউটার একটা পিসী মরাং গ্রামে থাকে তাও তাকে বলে দিলাম। বউটা পিসীকে লুকিয়ে চুরিয়ে অনেক ভেট পাঠিয়েছে। অনেক বস্তু দ্রব্য পাঠিয়েছে। সে কথা বলে দিলাম। পিসী বউটার ওপর অনেক তুকতাক করেছে। শিকড়বাকড় বেঁটে খাইয়েছে। সে কথা বললাম। কর্তা জানতো না এ সব কথা। দুনিয়ার আর কেউ জানতো না এসব কথা। কর্তা বউটাকে চেপে ধরতে সব স্বীকার করলে বউটা। কর্তা অবাক হলো। কিন্তু আমার দাবী মানলে না কর্তা। বললো তোকে "কেবাঙ্"এ যেতে হবে। গাঁয়ের বুড়ো বুড়ো লোকদের নিয়ে এ সভা। আর বুড়োরা যা বলবে 'কেবাঙ্'এ যা ঠিক হবে সে মতোই সবাইকে চলতে হবে। তা আমি কিভাবে "কেবাঙ্"এ যাবো। "কেবাঙ্"এ যেতে হলে আমাকে জমা দিতে হবে একটি মিথোন (ষাঁড়ের মতো দেখতে জন্তু) চারটে ভেড়া। এসব আমি কোথায় পাবো মিগম (স্যর বা মহাশয়)। "কেবাঙ্"এ যাওয়া আমার হলো না।"

– "তোমার সঙ্গে তোমার আগের জন্মের বউ-এর এরপর দেখাশুনো হয়েছিলো?"

– "নিশ্চয় হয়েছিলো। জঙ্গলের পথে বউটার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। বউটা আমাকে বললো – 'তুই আমাকে চাইছিস কেনরে? ইস তোর চেহারাটার কি হাল্ হয়েছে।'

– 'নতুন জন্ম নিয়েছি। তাই এ জন্মে আমার এরকম চেহারা হয়েছে। তা আমার চেহারা খারাপ হলে কি হবে। মনটা আমার ভালো আছে। মনটা আমার এতোটুকুন বদলায়নি।'

– 'ইস কি বিশ্রী চেহারা। কুঁজওয়ালা মানুষ আমার দু চক্ষের বিষ। তার ওপর তোর রয়েছে গলগন্ড। চোখটার কি হাল হয়েছে। কে তোর কাছে থাকবে বল দিকিন্।'

– 'তুই বাইরের রূপ দেখিসনে। মনটাকে বোঝবার চেষ্টা কর আমি তোর আগের পক্ষের স্বামী।'

– 'তাতে হয়েছে কি। তোর কাছে ফিরে গিয়ে কি লাভ হবে। তুই আমাকে ভালো করে খেতে দিতে পারবিনে। হাতীর মাংস খাওয়াতে পারবি? ভালুকের কলজে ভাজা করে দিতে পারবি। দ্যাখ আমার কর্তা কতো ধরনের পাথরের মালা আমাকে দিয়েছে। তুই পারবি দিতে।' – 'মিগম্, বউ-এর কথা শোন্। আমার চেহারাটা বদখত। আমাকে আর ওর পছন্দ নয়। আমি ওকে ভালো খাবারদাবার দিতে পারবো না।

আমি ওকে বললাম – 'তোর কর্তা কোনোদিন তোকে বউ-এর মর্যাদা দেবে না। স্রেফ দাসী করে রাখবে। সময় থাকতে আমার কাছে ফিরে আয়। তা বউটা আমার কথা শুনলে না। পাত্তাই দিলে না আমাকে।' টরা গলগন্ডে হাত বোলায়। কুঁজ চুলকোয় আর বাঁশের পাইপ টানে। অরণ্যে পপি ফুলের গাছ পুড়ছিলো। হরিয়াল, ঘুঘু, শালিক, নীলকন্ঠ সে ধোঁয়া প্রাণভরে টেনেছে। তারা মাতাল হয়েছে। নেশায় বুঁদ হয়ে জমির ওপর বসে পড়েছে।

– "জানিস নিগম, বউটার আমার ওপর শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস ছিলো।" বললাম –

'মনে আছে তোর এক রাতে পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করেছিলি। আমি সব জানতে পেরে কাটারীর কোপ বসিয়েছিলাম তোর উরুতে। অনেক রক্ত পড়েছিলো। ক্ষতের দাগটা নিশ্চয়ই এখনো মিলিয়ে যায়নি। ও কেমন যেন চমকে ওঠে। হাঁটুর ওপরের কাপড়টা ওপরে ওঠাতেই ক্ষতের চিহ্ন জ্বলজ্বল করে ওঠে। বউটা আমার কেঁপে ওঠে। এরপর আর আমাকে অবিশ্বাস করিসনে। আমি তোর আগের পক্ষের স্বামী।' কিন্তু মেয়েটার সেই এক গোঁ। আমার চেহারা খারাপ। আমি ভালো খেতে পরতে দিতে পারবো না। পারবো না কেবাঙের আদেশ মতো ক্ষতিপূরণ দিতে।"

টরা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। বাঁশের পাইপ টানতে থাকে।

টরা আবার আরম্ভ করে। – "কিন্তু মিগম, আমি আশা ছাড়িনি। ওর পেছু ঘুরে ঘুরে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

– "তোর মনে আছে ইয়ানি আমাদের সেই কচি নধর হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটার কথা।" ইয়ানি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেনো ভাবলো।

– "তোমার বউ-এর নাম বুঝি ইয়ানি?" প্রশ্ন করি।

– "হ্যাঁ।"

– "তোমার ছেলেটার কি হলো?"

– "চিতে বাঘে খেয়ে ফেলেছিলো।" আমি শুনছি।

– "বড়ো সুন্দর ছিলোরে ছেলেটা।" বলে ইয়ানি।

– "তুই আমার কাছে চলে আয় ইয়ানি। আবার আমাদের ওরকম ছেলে হবে।"

ওর গল্প বলার শেষ নেই।

– "উত্তর সিয়াং-এ ছিলাম অনেকদিন। টওয়াঙ আর টাঙগামদের ঘরে ওরকম একটি ছেলে দেখলাম না।" বলে ইয়ানি। ছেলে সম্বন্ধে আলোচনার পর থেকেই ও কেমন যেন উদাসীন। ছেলের গল্প ও খালি খালি শুনতে চাইতো। আমি সুযোগ পেলেই ছেলের গল্প করতাম। একদিন ইয়ানি বললো – "শুনেছি এ জন্মে ক্রীতদাসী হয়ে থাকলে মৃত্যুর পরও ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হয়।"

– "ঠিক শুনেছিস। কর্তাটা দাস দাসী মিথোন সম্পত্তি ক্রমশ বাড়িয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ কি? তার অর্থ মৃত্যুর পরও ওই দুনিয়ায় ওদের নিয়ে বহাল তবিয়তে থাকবে। তোকেও মৃত্যুর পর ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হবে। তোর মুক্তি নেই। ইয়ানির মুখে চোখে চিন্তার মেঘ আমি দেখতে পাই।" বলে টরা।

– "তাহলে ইয়ানি শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে চলে যেতে রাজী হলো।" বলি আমি।

– "দূর। দূর। ইয়ানিকে কর্তা স্রেফ যাদু করেছিলো। ও আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলো। দেখে নিস মিগম। আমি ইয়ানিকে কর্তার হাত থেকে যেকোনো ভাবে মুক্ত করবো। মৃত্যুর পর ওকে ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হবে না।" টরার গর্জনের সঙ্গে ডিনামাইটের গর্জনের সঙ্গে খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এরপর বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। পুরো মেলার স্থানটা ঘুরে বেড়িয়েছি বেশ কয়েকবার। মেলাতে দেখতে পেলাম ভালুকের খেলাটা বেশ জমে উঠেছে। টরা ময়াং ধনুকে তীর লাগিয়ে লক্ষ্যভেদে ব্যস্ত। জুয়ো চলছে। লক্ষ্যভেদ করতে পারলে পয়সা পাবে টরা। হঠাৎ টরা ময়াং ঘুরে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো ভালুকের বক্ষদেশ। তার ধনুক থেকে সাঁ করে তীরটা বেরিয়ে গিয়ে ভালুকটার বক্ষস্থল নিমেষের মধ্যে বিদ্ধ করলো। ভালুকটা টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে গেলো। তীরের ডগায় উগ্র বিষ। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো ভালুকটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হাত পা ছুঁড়ছে ভালুকটা। ভালুকটা একটানে মুখোশটা খুলে ফেলেছে। বেরিয়ে এসেছে একটি মনুষ্য মুখ। ট্রাইবের লোক। যন্ত্রণায় দাঁত মুখ খিঁচোচ্ছে। মুখটা ওর ক্রমশ নীল হয়ে যাচ্ছে। মেয়েপুরুষ ছুটে আসে। শুরু হয় জনতার কোলাহল। আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাই। হঠাৎ ভীড়ের ভেতর থেকে কে যেন আমার হাত ধরে টানে। তাকিয়ে দেখি টরা ময়াং। হাসিতে ওর সারা মুখ ভরে উঠেছে।––"মিগম, ইয়ানিকে আমি মুক্তি দিলাম। ইয়ানির কর্তাটাকে তীর মেরে শেষ করে দিয়েছি। কর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইয়ানির ছুটি। ইয়ানিকে আর ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হবে না। পরজন্মে আর ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হবে না। ইয়ানির নতুন জীবন শুরু হবে।"

– "তোমার কি হবে টরা?" আমার প্রশ্ন।

– "আমি মরবো। আমার ফাঁসী হবে। কেবাঙ আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। তবে তুই দেখে নিস মিগম, আমি আবার জন্মগ্রহণ করে ইয়ানির কাছে ফিরে আসবো।"

রটুং প্রান্তরে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। আমার অন্তঃকরণটা মোচড়াতে শুরু করেছে।□

CHINA CLAY

All Grades-Powder & Lumps
(A unique clay for Rubber & Pesticides)

Manufacturer & Exporter

PATELNAGAR MINERALS & INDUSTRIES (P.) LTD.

2, CHURCH LANE, CALCUTTA-700 001
Phone 23-9546/23-4726, GRAM KHARIMATI

Mines, Processing & Pulverising at
PATELNAGAR, P.O. MD. BAZAR T.S. 731132
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL
Phone Md. Bazar 23,24,25.
Gram KHARIMATI, SURI.

পুরানো দিনের বিধান সভা

সংকলকঃ শুভাশিস মৈত্র

স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্‌কালে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের বিধান সভা অধিবেশন। রাজত্ব চালাচ্ছেন লীগ মন্ত্রী সভা। মুখ্যমন্ত্রী সুবাবর্দি সাহেব। কেমন ছিল তখনকার বিধানসভা? বিধান সভার তখনকার আলোচনার ছবিটা ছিল কেমন, এই নিয়ে লেখা হয়েছে এই প্রতিবেদন। নানা বিচিত্র বিষয় এসেছে আলোচনার সূত্র ধরে। বিরোধী পক্ষ কতটা সম্মান পেতেন তখন বিধান সভায়, কতটা ধৈর্য ধরে শোনা হত বিরোধীদের কথা তা এই প্রতিবেদন থেকে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব। এই সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, এই সময়ই 'পাকিস্তান ডে' ঘোষণা করা হয়েছিল। এখানে আছে তরুণ জ্যোতি বসুর ইংরাজি বক্তৃতা, শ্যামাপ্রসাদের কন্ঠস্বর, রাস্তাঘাট নিয়ে হরিপদ চ্যাটার্জীর মজাদার আলোচনা আরো নানান রকমারি বিষয়।

March 1947
Pesant strueggle in North Bengal

Mr Jyoti Bose Sir I beg to move that the demand of Rs 2,53, 72,000 for expenditure under the head "25-General Administration' be reduced by Rs. 100. I move this to raise a discussion about the failure of the Govt. to remove the present District Magistrate, Mr Bastin, from Mymensingh in defence to popular demand.

This demand for the removal of Mr Bastin is the demand of an oppressed humanity in Bengal and it finels and ready echo in the hearts of all bengalis, because Mr. Bastin is not only on individual: he represents that malevolent and blood thirsty type of officials who to day in Dinajpur Jalpaiguri, Rangpur, Khulna, Midnapur, 24 Pgs etc., are burning and destroying kissan homes, are killing kissan men, women and children by the dozens and looting their properties. Mr Bastin is if I may use strong language, a finished rogue from oxford.

Mr. Mazharul Hanque On a point of order Sir Is it purliamentary to use the term "rogue" about an officer ?

Mr. Speaker He is not present have to defend himself. Mr Basu, you can not use strong language against an officer who is not present here and cannot defend himself.

Mr. Jyoti Bose All right Sir The Chief minister is here, and he always gallantly defends his police officers and district officers. That is why I used that

strong language.

Mr. Speaker That is a personal attack--------

Mr. Jyoti Bose This Officer he started his head hunting in Susang, because a tribal expert here, and in his young oxford days he learnt antropology I belive Before he started head hunting expedition this officer through a miasma of lies and deceit tried to creat the impression that kissans and hajangs, peasent Hajangs were in rebellion. I have got this from two British officers who had at the point of Brenguns directed me to a police station. When I asked them why they were there, they told me they were there because they were told of a Hajang rebellion. When I asked them whether they have seen any signs of rebellion of the kissans, they plainly told me 'not yet' They were there for about 21 days by them. This magistrate installed the Eastern Fronlier Rifles which always perpectrated savage crimes against all peoples movements in Bengal. This lead have been followed everywhere in other districts of Bengal where similar atrocities are taking place against people. I have just been told by Rupnarayan Roy who has just returned from Dinajpur tour a few days back, that the police arrested him, bound him with ropes and beat him up Mr Rupnarayan Roy is an M.L.A. Again I repeat all this has happened in spite of the fact as I have stated once that there was no violence on the part of the kissans. Not a single thing has been looted by them not a single jotedar has been killed. Again I repeat move of their mothers, wives and sisters has been dishonered by the kissans, and yet in the name of lawlessness and disorder we find Mr Suhrawardy's officers creating havoc in the country side. All this because of the simple demand of the tebhaga movement and that the tanke system must go. At best it is a matter of the civil courts. But I have yet received no answer either from the Hon'ble the Chief Minister or from the other minister for that matter as to what they intend to do with on the Bargadars Bill—Because they

have not the courage to tell me that they will not proceed with it or they will proceed with it because they know the answer they will get from their own Muslim kissans, from their own men yet Suhrawardy the Chief Minister has not answered me about police lawlessness. I have given him the facts and figures of their law lessness. He has not answered me under what law, under what provisions of his Ordinance this crimes are being committed against kissan humnity by the Magistrate whose hands are reaping it the blood of kissans In other civilised countries of the world they would have been tried and hanged, but here I find that they are feted by the Governor, the exporter Governor of this country, and I find Mr Suhrawardy Suppurting them because otherwise it demoralised his officers. So the officers head hunting expedition must continue. I appeal to him his head hunting must stop and once for all these officers must to taught that they can not carry on this in this fair land of Bengal. □

দুর্ভিক্ষ

মার্চ: ১৯৪৭

প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়

গ্রামীন এলাকাতে চালের যোগান সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট ছাড়া আর কে দেবে? সুতরাং আমাকে সিভিল সাপ্লাই সম্বন্ধে কথা না বলে উপায় নাই। আমি সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রীর নিকট কতগুলো কংক্রিট উদাহরণ রেখেছিলাম কিন্তু তাঁর কংক্রিটের তৈরি মাথায় তা ঢোকাতে পারিনি। পুরাতন বুলি আউড়ে তিনি বলে বেড়াচ্ছেন কোথাও দুর্ভিক্ষের কোন আশংকা নেই। বহুদিন পূর্বে কোটালিপাড়া দুর্ভিক্ষের সময় তদানীন্তন ঢাকার কমিশনার স্যার বেটসন বেল-এর ফেমিন কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা যদি পড়েন তাহলে অবাক হয়ে যাবেন। তিনি কোটালিপাড়ায় তদন্তে গিয়ে বলেছিলেন যে, 'সেখানকার গাছে এখনও পাতা আছে, গাছে পাখি ডাকে, দেশে কুকুর, বেড়াল এখনও ঘুরে বেড়ায়, অতএব সেদেশে দুর্ভিক্ষ হয়নি, হতে পারেনা।' বর্তমান মন্ত্রী মন্ডলী সেই পুরাতন বেল সাহেবী বুলি কপচে বেড়াচ্ছেন। গত দুর্ভিক্ষে যখন বাংলার ৩৫ লক্ষ লোক মরল, তখনও তিনি বলে বেড়িয়েছিলেন এখানে কোন ফেমিন হয়নি। এবং এই কথা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। আজও বাংলার সর্বত্র, বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তর বাংলায় বিরাট ভাবে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে লোকেরা ২৫ টাকার নিচে চাল কিনতে পারছে না। কৃষকের হাতে ধান চাল থাক বা না থাক গভর্ণমেন্ট প্রত্যেকটি লোককে খেতে দিতে বাধ্য, একথা ভুলে গেলে চলবে না। নিষ্ক্রিয় মন্ত্রীমন্ডলী জনসাধারণের রক্ত জল করা অর্থে gramfed হয়ে পরিপুষ্ট দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরবার পথে বসেছে। -------
আমি বলতে চাই এবারকার দুর্ভিক্ষে যদি মৃত্যুর কারণ ঘটে তাহলে "Tooth for tooth, eye for eye" দিতে হবে। এবার যাদের উপর মৃত্যুর হস্ত প্রসারিত হচ্ছে তারা নীরবে শোভাযাত্রা করে মরণের পথে এগিয়ে যাবে না। সুতরাং আমি

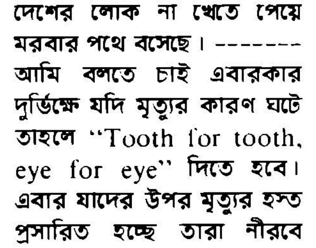

মুসলিম লীগ পার্টির ভাইদের অনুরোধ করছি যে এই সমস্ত অপদার্থ আহাম্মকের দলকে সেখানে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করুন। যাঁরা মানুষকে খেতে দিতে পারেনা মন্ত্রীত্বের গদী আঁকড়ে ধরে থাকবার তাদের কোন অধিকার নেই। □

উত্তর বঙ্গের নদী

মার্চ: ১৯৪৭

সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

মাননীয় প্রমুখ মহাশয়, আমার সহযোগী শ্রীযুক্ত খগেন দাশগুপ্ত মহাশয়ের যে ব্যয় ছাঁটাই প্রস্তাব, আমি তা সমর্থন করি।

এখন বাজেট সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই।

জিজ্ঞাসা করি গত বৎসরে এবং তার পূর্ব বৎসরে তাঁরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন সে টাকা কি ভাবে খরচ করেছেন? দামোদর স্কীম করে কত টাকা দামোদরের উদরে নষ্ট করেছেন? কত টাকা নিয়ে কি কি কাজ করেছেন? তার একটা হিসেব পর্যন্ত উপস্থিত করলেন না। একটা সামান্য প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি, সেও তাঁর কার্যের বিবরণ লিখে রাখেন, আর কত বড় একটা টাকার মালিক মন্ত্রী মহাশয় তিনি জলের হিসাব দিলেন না, কোনো পুরানো কি এক হিসাব আমাদের কাছে উপস্থিত করলেন। কি, করেন-না-করেন তা বুঝি বলতে লজ্জা হয়?

উত্তরবঙ্গে জল সেচের অভাব।..... উত্তরবঙ্গের নদীর কথা বলতে গেলে দু:খ হয়।

..... ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা চর পড়ে আসল ভূখন্ড থেকে অনেক স্থানে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। যে ত্রিস্রোতা একদিন দেবী চৌধুরানীর বজরা বুকে নিয়ে সাহেবকে ভয় দেখিয়েছিল সে আজ ক্ষীণস্রোতা, ধরলায় আজ ধারা নাই, সদানিয়া, করতোয়া

আজ অর্থসচিবের প্রাসাদের পাদদেশে শুষ্কতোয়া। মানসের জল আজ মানস স্মারণে পর্যবসিত। গজারিয়ায় আজ আর গর্জন নেই। বাঙালী আজ কাঙালীর মত। ঘাঘটে আজ ঘর্ঘর শব্দ নাই। নাগর আজ বাড়ি বাড়ি ভ্রমণে অসমর্থ। যমুনা পার করতে আজ আর কৃষ্ণকে কান্ডারী করতে হয়না। তুলসী গঙ্গার গঙ্গা প্রাপ্তি হয়েছে। তুলসীর বদলে আজ আর বুকে কচুরিপানা। শ্রীর আজ আর শ্রী নেই, সে বিশ্রী। হারামতি আজ হারিয়ে গেছে। মহানন্দা আজ আর আনন্দ দেয় না, জল ঢাকা আর জলে ক্ষেত পাথর ঢাকে না। তোড়সার আজ সে তোড় নেই। সংকোশ আজ সংকোচে সঙ্গীন।

.....উত্তরবঙ্গে তিস্তা প্রজেক্ট করছেন শুনতে পাচ্ছি। তার নাকি স্কিম করতেই লাগবে ১৫ বৎসর। যে মন্ত্রীরা দরিদ্রের ভোটে দেশের সেবা করবার প্রতিশ্রুতিতে নির্বাচিত। আজ তারা কিছুই করছেন না। □

মদ্যপান

মার্চঃ ১৯৪৭

নিশাপতি মাজিঃ

মি: স্পীকার স্যার------
আমি বীরভূম জেলা হতে পচাই মদের দোকান উচ্ছেদ করবার জন্য কতবার আবেদন করেছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বীরভূম জেলার মোট ২৫৩ টি পচাই মদের দোকান আছে, সেগুলি উঠিয়ে দেবার জন্য আমি পুনরায় অনুরোধ করছি। এবং আরও অনুরোধ করছি যে মদ তাড়ি তৈরি করবার জন্য যে লাইসেন্স দেওয়া হয় সে Lisence বন্ধ করে দেওয়া হক; যাতে দেশের মধ্যে কোন মদ, তাড়ি তৈরি হতে না পারে। আজ দেশে খাদ্য শস্য এবং অন্যান্য

উপকরণের অভাব, সেদিকে লক্ষ্য রেখে যাতে আর সেগুলি নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। আজ এ কথা বোধ হয় সকলেই জানেন যে বীরভূম জেলায় ডোম, মুচি, মেথর, সাঁওতাল ধাঙর, কোঁড়া প্রভৃতি জাতের সকলে পচাই মদ খেতে অভ্যস্থ। অনেক দিন হতে ঐ জেলায় পচাই মদের দোকান চলে আসছে বলে সেখানে ৬ বৎসর হতে ৮০ বৎসর পর্যন্ত সকল নরনারীই পচাই মদ খেয়ে থাকে। এই কারণে তাদের আর্থিক, নৈতিক ও দৈহিক অবস্থা

ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আজকালকার দিনেও তাদের শিক্ষার কোন আগ্রহ নাই বললেই চলে। ------কিন্তু লজ্জার কথা যে বাঙলা দেশে ১৯৩৮ সালে আবগারীর আয় ছিল ১০ লক্ষ টাকা আর আজ তা হয়েছে ২৪ লক্ষ টাকা। ------- এখনও পর্যন্ত এই দুর্মূল্য চাউল নষ্ট করে পচাই তৈরি হচ্ছে। হিসাব করলে দেখা যাবে যে ১৯৪২ সালে ২৩৪, ৭২৫ মন চাউল মদ তৈরি করে নষ্ট করা হয়েছিল আর ১৯৪৩ সালে ২৪৩, ৯৯০ মন চাউল নষ্ট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যারা দেশের এই দরিদ্র জনসাধারণকে মদ খাইয়ে ফেলে রাখতে চান যাতে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে যেতে পারে। তাঁদের পক্ষে এটা খুবই লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। (মদের জন্যই) দেশে ফৌজদারী মামলা দিন দিন বেড়ে চলেছে, স্বভাব কদর্য হয়ে পড়ছে, আর্থিক অবনতি ঘটছে। □

Dr Shyamaprasad Mukherjee

Mr. speaker, Sir, It is just five months ago when the incidents which shook Bengal and the rest of India took place in Noakhali and Tippera. It is indeed a matter of great regret and humiliation that we should be standing here today and questioning the 'bona fides' of the Government in dealing with their relief and rehabilitations policy. .....We have been shocked to read the announcement the Goverment have decided to close down the relief in Calcutta as also in Noakhali and Tippera. During the last two days I have been in close touch with the inmates of the four relief camps which are run by the Govt in Calcutta and Howrah. There are today nearly about 1500 people living in these places. Men, women and

children of all classes and conditions of Hindu Society. There are 45 of them who are suffering from smallpox and chiken-pox, 48 are suffering from other diseases, there are 32 women who are pregnant; there have been 16 cases of delivery during the last fortnight or so. It is shocking to think any civilised Govt. without enquiring into the details of the conditions of these people should decide from the secretariat that they are to remove themselves from these camps tomorrow, the 15th March.-------------Then I shall tell you what is the intimation that has been sent by those people from Noakhali and Chandpur.

"Do not come and do not think of bringing women folk and your families to these areas" One letter says, last night there was a loot in our locality: we had to run to our garden for fear of life. All these letters have been received only within 10 days. There are reports to the following effect: "Arson, loot and forcible seizure of property are going on. Muslims refuse to work for Hindus"------

কলকাতার দাঙগা

ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত

মার্চ ১৯৪৭

মি: স্পীকার স্যার, আমার দায়িত্ব বোধ থেকেই আজ হাউসে আমি কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙগা চিত্রটি কি অবস্থায় পরিণত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে সামান্য রেখা পাত করতে চাই। এর আগেও আমরা সরকারের সামনে কলকাতার দাঙগা পরিস্হিতি তুলে ধরেছিলাম, তখন আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে এই অবস্হার। কিন্তু সমস্ত মধ্যকলকাতা জুড়েই অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেছে। সার্কুলার রোড, মানিকতলা, রাজাবাজার, সুরেন ব্যানার্জী রোড বাগমারি এবং অন্যান্য জায়গাতে যদিও এখনও বিশাল পুলিশ বাহিনী আছে। কিন্তু এই বিশাল বাহিনীর সামনেই ঘটছে সমস্ত ঘটনা, পুলিশ দাঙগাকারীদের হটিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই করছে না। আমার কাছে যা খবর আছে সেই অনুসারে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে এখনও পর্যন্ত ৪৫ জনকে ভর্তি করা হয়েছে যার ভেতরে ৮ জনের শরীরে সাঙঘাতিক আঘাতের চিহ্ন বর্তমান এবং অবস্থা সংকটজনক। কিছুক্ষণ আগেই আমি খবর পেয়েছি ৩-এ রুটের একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজাবাজার অঞ্চলে এবং এটা করা হয়েছে পুলিশের সামনেই।------এই মাত্র আমাকে খবর পাঠান হয়েছে ইয়োরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেন আক্রান্ত হয়েছে।

বাগমারিতে একটি গেঞ্জি কারখানায় আগুন লাগান হয়েছে। এর থেকে কি এটাই বোঝা যায় না যে সরকার থেকে কড়া হাতে দমন করবার কথা বার বার বললেও, অঞ্চলে সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছে!

দ্য অনারেবল সুরাবর্দিঃ

আমি এই মুহূর্তে প্রস্তুত নয় এই ঘটনার সত্যতার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলতে। এটা খুবই দু:খের যদি ব্যাপারটা এরকমই ঘটে থাকে।------সকালের একটি ছোট্ট ঘটনা আমি জানি, একটি খর বোঝাই গরুর গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। পরে অন্য একটি ঘটনায় উত্তর কলকাতায় বাসে ঢিল ছুঁড়বার জন্য ঐ রুটে বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজকের ঘটনায় ৯ জন আহত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে একজনের। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ১০ জন। এছাড়া আমার কাছে যা খবর আছে তাতে বলা যায় শহর জীবন ছিল স্বাভাবিক। কার্ফু অবশ্য পুরোপুরি তুলে

নেওয়া হচ্ছে না। যে মেয়াদ কমান হচ্ছে কার্ফুর সময় ধরা হয়েছে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ৬-৩০ পর্যন্ত।

-------আমি খুবই আহত হব যদি এটা প্রমাণীত হয় যে পুলিশ আমাদের নির্দেশ সত্বেও তা অমান্য করে চলেছে। আমি অবশ্যাই বিরোধী নেতাদের সঙেগ নিয়ে নগর পরিদর্শনে যাব এবং আশা করব অবস্থা এরকম থাকবে না, পাল্টাবে। □

মেরামত করে দিতেন তাও কিছু হত। বর্ষাকালে এসব পুল পার হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। নৌকার কোন ব্যবস্থা থাকেনা। কোথাও গোপাল কাছা করতে হয়, কোথাও এক বুক, কোথাও গলা জল।-----স্বর্গীয় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একবার এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন 'কলিকাতা হতে বিলাত যেতে যে কষ্ট না পেয়েছি তার চেয়ে বেশি কষ্ট এখানে পেলাম।' সেতো তবু শীতকাল। বর্ষাকাল নয়। এই রাস্তাটির উপরের পুলগুলি অন্ততঃ মেরামত করে দিলে নদীয়া মুর্শিদাবাদের যে সমস্ত লোক এই রাস্তায় যাবার সময় বাংলা সরকারকে গালাগালি করতে করতে যান অন্তত: সেটা হতে রেহাই পেতেন। □

রাস্তাঘাট

মার্চ ১৯৪৭

হরিপদ চ্যাটার্জী

মি: স্পীকার, স্যার, এখানে কিছু বলাটা অরণ্যে রোদন করা। আর এঁরা যে মন্ত্রী এবং এঁদের যে যোগ্যতা তা রাস্তা-

ঘাটের অবস্থা থেকেই বেশ বোঝা যায়। Indian Government যে টাকা দিয়েছিলেন তা পর্যন্ত তারা ব্যয় করতে পারেন নাই। এঁরা পারেন কেবল নরকের রাস্তা তৈরি করতে। দেশের রাস্তা নয়। আমি এখানে একটা রাস্তার কথাই বলছি সেটা পলাশী মেহেরপুর রাস্তা। এই রাস্তা বহু জেলার লোকই ব্যবহার করে থাকে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এমন কি পূর্ববঙেগর যে সকল লোক বেলডাঙার ঘাটে আসে তাদেরও এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হয়।------কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাস্তা motorable হওয়া দূরের কথা, মানুষ হেঁটে গেলেও হোঁচট খায়। বর্ষাকালে এই রাস্তায় যাতায়াতের কষ্টের অন্ত থাকে না, কবে বন্যার জল এসে এই রাস্তা ভেঙেছে কিন্তু তা আর মেরামত হল না। যে চারটি পুল ভেঙেছে অন্তত সেইক'টি-যদি

শ্রমিকবস্তি

Mr Joyti Basu

March 1947

Mr. Speaker, Sir

.......I move this to raise a discussion about the failure of the Govt to protect the bustee dwellers against eviction.

Sir,

The Hon'ble minister for labour has not given slightest protection to the workers in their factories either by way of legislation for minimum wages or by way of improving their working conditions. Whenever the workers have in the last resort gone into strike for more wages or a decent standard of living, the Hon'ble minister has been silent. It has been the same when 'Lathies' rained on the workers, or they have been shot down and section 144 has been clamped in them to destroy the working class movement But we find thousands and thousands of these workers who are living in the 'bustees' from generation to generation-both tenants and small hut owners-are being thrown out of their huts. As far as I know, notice have been given to more than 40,000 such bustee dwellers to clear out altogether with their families. The Hon'ble Minister can not do anything about them again in the name of law, but at the same time we find........

Sir I would not waste much time to convince the labour Minister, but I would ask him to descend from his olympian heights in writer's buildings and sometimes to remember his past a bit and go and visit the workers in the bustees....... □

কলকাতার ট্রাম বাস মার্চঃ ১৯৪৭

ড: সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি

মি: স্পীকার স্যার কলকাতা শহরে যত লোক ট্রেনে ও বাসে চলে তার মধ্যে ১/৩ লোক চলে বাসে আর ২/৩ লোক ট্রামে। এ থেকেই বাসের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়া যদি বাস না থাকে আর ট্রামে স্ট্রাইক চলে তাহলে রাস্তায় চলাফেরা করা কিরূপ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তা কলকাতায় সকলে আজ হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন। এখন বাস চলছে বলে বাসের ভিতরে দাঁড়িয়ে বা বাইরে ঝুলে লোক কোনরকমে কলকাতায় যাতায়াত করছে।...... অথচ এই বাস চালকগণ ও কনডাকটরগণকে পুলিশের হাতে নানা রকম অত্যাচার সহ্য করতে হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বা বাসস্ট্যান্ডে যে সব জমাদার কিংবা পুলিশ থাকে তাদের অভাবপড়ে ড্রাইভার ও কনডাকটরদের কাছে হাত পাতে। তখন তাদের হাতে টাকা কিংবা আধুলি না দিলে তারা পেছন হতে বাসের নম্বর টুকে নিয়ে লালবাজারে পাঠিয়ে দেয়। ----নিজেদের নিরপরাধ প্রমান করবার জন্য সাক্ষী হাজির করবার সুযোগ তারা পায়না। কারণ সে বেচারারা জানেনা কোন সময় তাদের বাসের নম্বর টুকে নেওয়া হয়েছে; এবং সেসময় কোন কোন লোক তাদের বাসের যাত্রী ছিল।

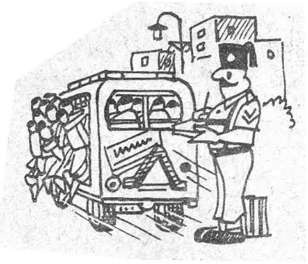

-----এবং সঙ্গে সঙ্গে ২০, ২৫, ৩০, টাকা জরিমানা হয়ে যায়। এই ভাবে প্রতিদিন অসংখ্য বাসড্রাইভার ও কনডাকটরকে জরিমানা দিতে হচ্ছে।----- পুলিশের এই অন্যায় অত্যাচারের অবসানের জন্য বাংলার জনগণও অনেক কিছু করতে পারে। যদি জনমত এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ জানায় তবে আশা রাখি এই অত্যাচারের অবসান অচিরেই সম্ভব। □

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভার স্পীকার ঈশ্বরদাস জালান

আইনে ও অবহেলায় বন্দী মেয়েদের খেলার মাঠ

মালা দত্ত

ফেব্রুয়ারী থেকে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে মহিলা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়েছে। এই খেলায় ভারতীয় দলে বাংলার তিনজন মাত্র মেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বাংলা থেকেই সবথেকে বেশি মহিলা ক্রিকেটার জাতীয় দলে নির্বাচিত হতেন। শুধু তাই নয় জাতীয় প্রতিযোগীতায়ও বাংলা সাতবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মত দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছিল। কিন্তু সেই বাংলা দলের আজ হতশ্রী অবস্থা। ক্রিকেটাররা হতাশায় ভুগছে। ৮১-৮২ সীজন থেকে এখানে সমস্ত লীগ ও নক আউট খেলা বন্ধ। বন্ধ প্র্যাকটিশ। খেলার জন্য অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও খেলতে পারছে না। কোনরকম প্র্যাকটিশ ও প্রতিযোগিতা ছাড়াই জাতীয় ও টেস্ট খেলাতে তাদের যোগদান করতে হচ্ছে। ফল হচ্ছে শোচনীয়। অন্যদিকে অন্যান্য রাজ্যের মেয়ে ক্রিকেটাররা আগের থেকে অনেক উন্নতি করে জাতীয় দলে তাদের স্থান করে নিচ্ছে।

একটি মামলাকে কেন্দ্র করে তিন বছর ধরে খেলা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ১৯৮২ সালে কয়েকটি ক্লাবের পক্ষ থেকে মহিলা ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের দুজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রথমে সম্মিলিত এ্যাথালেটিক ক্লাবের সম্পাদক দিলীপ দাস সেক্রেটারী কুমকুম ব্যানার্জী ও ট্রেজারার বুলবুল গায়েনের বিরুদ্ধে এই মামলা করেন। পরে অন্যান্য ক্লাবও তাতে যোগদান করে। ক্লাবগুলোর বক্তব্য এই যে মৌখিক ভাবে তারা বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেকবার প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু তাতে কোন প্রতিকার না হওয়ায় তারা আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন। এই অন্যায়গুলোর মধ্যে রয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভা ঠিক সময়ে না ডাকা, টাকা পয়সার হিসেবপত্র ঠিকমত না দেওয়া, নির্বাচন সময়মত না করা ইত্যাদি। ১৯৮১ সালে ইডেনে ইংলাণ্ড বনাম ভারতের মধ্যে যে টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল তাতে ১,৮,৬০০০ টাকা সংগৃহীত ও খরচা হয়েছিল বলে কর্মকর্তারাই জানিয়েছিলেন কিন্তু তার কোন হিসেব দেওয়া হয়নি। নিউজিল্যান্ডে ১৯৮২তে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে কার্যকরী সমিতির অনুমোদন ছাড়াই ৪০,০০০ টাকা খরচা করা হয়েছিল। এসব কারণেই বাধ্য হয়ে ক্লাবগুলো আদালতে গেছেন।

এরপর সেক্রেটারী ও ট্রেজারারের উপর সিটি সিভিল কোর্ট থেকে ইংজাংশন জারী করা হয় এবং আদালত থেকে একজন রিসিভার নিয়োগ করা। এঁরা তখন আবার হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ বার করেন। শেষ অবধি হাইকোর্ট থেকে দেব মুখার্জীকে স্পেশাল অফিসার রূপে নিয়োগ করে তাকেই নির্বাচন ডাকার ভার দেওয়া হয় কিন্তু কর্মকর্তা দুজনের উপর স্থগিতাদেশ থেকেই যায়। কিন্তু এই স্পেশাল অফিসারের বিরুদ্ধেও ক্লাবগুলোর অভিযোগ রয়েছে কারণ তিনি ট্রেজারার বুলবুল গায়েন, যার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তাকেই সভা করে বাইরে পাঠান।

কার্যত যখন কর্মকর্তা দুজনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তখন থেকেই সমস্ত খেলা বন্ধ হয়ে রয়েছে। কর্মকর্তারা অবশ্য বলেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো উদ্দেশ্যপ্রসূত। তাদের বক্তব্য বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকতে দেরী হয়েছে ঠিকই তবে এই ব্যাপারটা নিয়েও সভাতে আলোচনার কথা ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের বিরুদ্ধে যে ১,৮৬০০০ টাকা গায়েব করার কথা উঠেছে সেটাও মিথ্যে। এত টাকা সংগৃহীত বা খরচা হওয়ার কথা তাঁরা বলেন নি। তাঁদের মতে ক্লাবগুলো যে টাকা দেয় তাতে কিছুই হয় না। তাঁরা অনেক পরিশ্রম করে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করেন। ক্লাবগুলো আদালতে যে অডিট অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে বলেছেন তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ তারা দেখাতে পারেন নি। স্পোর্টস কাউন্সিল যে টাকা দেয় সেই পরিমাণ টাকা তাঁরা ক্লাবগুলোকে দিতে বলেছিলেন কিন্তু ক্লাবগুলো তাতেও রাজি হয়নি।

দুপক্ষের এই চাপান–উতোরে উলুখাগড়া হয়ে পড়েছে খেলোয়াড়রা। সেই ১৯৮২ সাল

লীগে বাংলার প্রাক্তন অধিনায়িকা শ্রীরূপা বসু ও অন্য এক খেলোয়াড় ব্যাট করতে নামছেন।

জ্যোতি বসুর স্ত্রী কমলা বসু সিঙগল উইকেটে জুনিয়র টীমের রীতা বসুকে প্রাইজ দিচ্ছেন।

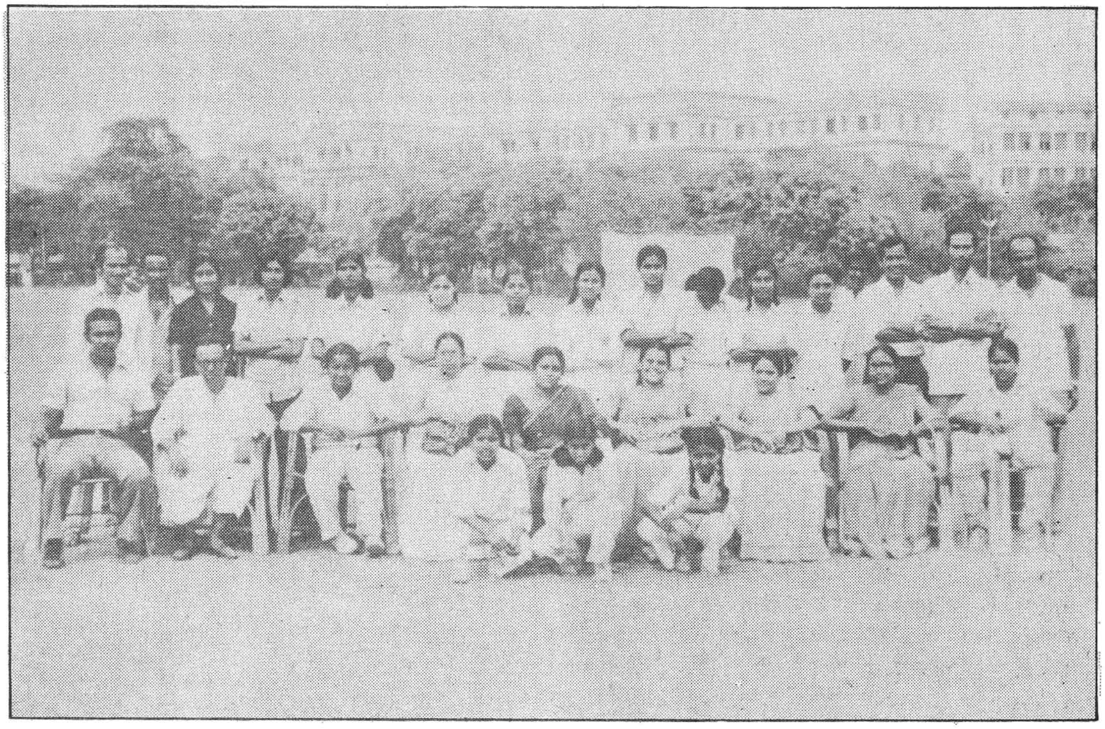

▲ ১৯৭৭–লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় চ্যাম্পিয়ান সম্মিলিত এ্যাথলটিক ক্লাব ও রাণার্স টালিগঞ্জ উইমেন ক্লাবের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা মাঝখানে এ্যাসোসিয়েশনের দুই সহ সম্পাদিকা

থেকে সমস্ত লীগ ও নক আউট খেলা বন্ধ হয়ে আছে। তার ফলে দিন দিন বাংলার মেয়েদের খেলার দক্ষতা কমে যাচ্ছে। ১৯৭৩–এ প্রথম মহিলা ক্রিকেট কয়েকজনের বিশেষ উদ্যোগে শুরু হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীমতী অলোকা উবিল। ১৯৭৬ থেকে মোটামুটি পুরো উদ্যমে লীগ শুরু হয়। ২৪টি দলের মধ্যে প্রথমে চারটে গ্রুপ এবং প্রত্যেক গ্রুপে দুটো করে টিম নিয়ে প্রাথমিক ভাবে লীগ শুরু হয়।

লীগ–এর খেলা শেষ হওয়ার পর যারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হয়েছিল তাদের নিয়ে পরবর্তী সময়ে নক আউট হবার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা হয়নি। তবে ১৯৭৭ সালে ১৫টি দল নিয়ে দুটি গ্রুপে খেলা পুরোদমে শুরু হয়। মেয়েদের মধ্যে এক বিরাট উৎসাহ দেখা দিয়েছিল এসময়। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ বেশ উদ্যোগের সঙ্গেই লীগ ও নক আউট খেলাগুলো চলেছিল। এরই ফলশ্রুতি রূপে জাতীয় প্রতিযোগীতায় বাংলা দল বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেয়। নয় বারের জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে সাতবারই তারা চ্যাম্পিয়ন। টেস্ট ম্যাচগুলোতেও বাংলার ক্রিকেটাররাই বেশি বেশি নির্বাচিত হত।

এই দুর্লভ সম্মান কিন্তু বাংলার পুরুষ ক্রিকেটাররা কখনও নিজ রাজ্যে বয়ে নিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু মহিলা বলেই বোধহয় সংবাদপত্রের পাতায় এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধের ব্যাপারে এরা অবহেলিত থেকে গেছে। বিরাট বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধের মধ্যেও মেয়েরা এই সম্মান পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিয়ে এসেছিল। প্র্যাকটিশ করবার মত নিজস্ব মাঠ তারা কখনও পায়নি। এ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব মাঠ নেই এবং নিজস্ব রেজিস্টার্ড অফিসও নেই। কর্মকর্তারা বলেন তাঁরা মাঠের ব্যাপারে পুলিসকে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু পুলিস থেকে বলা হয় মেয়েদের জন্য বেশি নিরাপত্তার দরকার হয় সেটা তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই কলকাতার বিভিন্ন বড় বড় ক্লাবগুলোর কাছে অনুরোধ করে যখন যে মাঠ পাওয়া যায় তখন সেখানে প্র্যাকটিশ হয়। কিন্তু সেখানে পোশাক পাল্টাবার জন্য মেয়েরা আলাদা কোন টেন্ট পায় না। যখন একই সঙ্গে ওই ক্লাবেরও কোন খেলা থাকে তখন মেয়েরা অসুবিধের মধ্যে পড়ে। তাছাড়াও এতদিনের মধ্যে মেয়েদের নিয়ে কোন সুষ্ঠু কোচিং–এর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সারা বছরে জাতীয় খেল্যার শুরু হওয়ার আগে মাত্র দু মাসের প্র্যাকটিশ করিয়ে পাঠানো হত। কিন্তু পরে তা কমে ১৫ দিন বা সাতদিনে নেমে এসেছিল। একটা সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে হঠাৎ ছ ঘন্টার নোটিশে সিনিয়ার, জুনিয়ার বা সাব–জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান করতে হত। তবে কর্মকর্তারা বলেন এ ব্যাপারে তাঁরা অসহায় ছিলেন, কারণ দিল্লী থেকে যে আদেশ আসত তাই তাঁদের পালন করতে হত।

একদিকে যেমন হাজার অসুবিধের মধ্যেও বাংলার মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে তেমনি প্রচুর মেয়ের মধ্যে এই খেলাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্য একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু লীগ বা নক আউট খেলাগুলো ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলে অবধি চলে। এর জন্য স্কুলের অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রীরা যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তাদের পক্ষে যোগদান করা মুশকিল হয়ে পড়ে। যদি খেলাগুলো ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ হয় তাহলে এরাও অংশগ্রহণ করতে পারে। এদের মধ্যে থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ও খুঁজে নেওয়া সম্ভব হয়। ক্লাবগুলোর আরও ক্ষোভ এইজন্য যে লীগ চ্যাম্পিয়ন যারা হয় তাদের কোন রকম পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হয় না। ১৯৭৭ এবং ১৯৭৯ সালেই শুধু তা দেওয়া হয়েছিল। এমনকি জাতীয় প্রতিযোগীতায় যখন তারা ফিরে আসে তখনও এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাদের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য কেউ উপস্থিত হয় না বা কোন রকম অনুষ্ঠানও হয় না। এদের আরও অভিযোগ এই যে, যখন লীগ এবং নক আউট খেলাগুলো চলে তখন সিলেকশন কমিটির সভ্যরা মাঠে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন মনে করেন না। সেজন্য জাতীয় প্রতিযোগীতার সেই পুরনো খেলোয়াড়দের

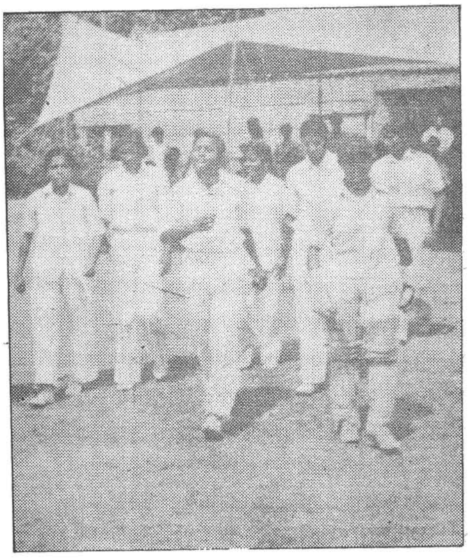

মেয়েরা ফিল্ডিংয়ে নামছেন

দিয়েই দল গঠন করা হয়। জুনিয়ার গ্রুপ থেকে নতুন প্রতিভাকে তুলে আনার ব্যবস্থা করা হয় না।

অথচ দেখা গেছে যে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ এই সময়টাতে যখন খেলা পুরোদমে চলেছিল তখন প্রচুর প্রতিভাসম্পন্ন নুতন মেয়ে পাওয়া গিয়েছিল। জুনিয়র টীম থেকে অনায়াসেই এদের নিয়ে নতুন শক্তিশালী দল গড়া যেত।

যে সমস্ত ক্লাবগুলো এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে সম্মিলিত এ্যাথলেটিক ক্লাব, হোয়াইট বর্ডার ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা ক্লাব, ইস্ট ক্যালকাটা ক্লাব, টালিগঞ্জ উম্যান ক্রিকেট ক্লাব উল্লেখযোগ্য, এই সমস্ত ক্লাবে বেশ কিছু মেয়ে ছিল যারা যথেষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড়।

এদের মধ্যে ইস্ট ক্যালকাটা ক্লাবের সন্ধ্যা ভট্টাচার্য যথেষ্ট সম্ভবনাময় খেলোয়াড়। বোলার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। এমনকি সিনিয়র মেয়েরাও ওর বলে খেলতে যথেষ্ট অসুবিধের মধ্যে পড়তেন। সম্মিলিত ক্লাবের সুজাতা নাথও বলে খুব ভাল ফল দেখিয়েছিল। হোয়াইট বর্ডার ক্লাবের প্রতিমা চক্রবর্তীর ব্যাটিং মনে রাখবার মত। ঠিকমত প্র্যাকটিশ পেলে জাতীয় পর্যায় থেকে টেস্ট ম্যাচে সে উঠে আসতে পারে সহজেই।

এ ছাড়াও পাঠচক্র ক্লাবের কেয়া ভট্টাচার্য আরেকজন সম্ভবনাময় খেলোয়াড়। ব্যাটিং-এ ওর দক্ষতা সবার নজরে পড়েছে।

কিন্তু জুনিয়র টিম থেকে এই সমস্ত সম্ভবনাসম্পন্ন মেয়েদের ঠিকমত কোচিং ও প্র্যাকটিশ দিয়ে নতুন দল গঠন করার চেষ্টা কখনও হয়নি।

খেলোয়াড়দের আরও অভিযোগ খেলোয়াড়দের থেকে কখনও কর্মকর্তা বাছাই করা হয় না। নামী খেলোয়াড় শ্রীরূপা বসু বললেন—এখানে নিয়ম রয়েছে যে কর্মকর্তা হলে খেলতে পারবে না। সেজন্য কর্মকর্তা হচ্ছেন সেই সব ব্যক্তি যাঁরা কখনও খেলেন নি ফলে খেলোয়াড়দের অসুবিধেগুলো তাঁরা ঠিক সেভাবে বুঝতে পারেন না। অন্য রাজ্যে এই নিয়ম নেই। এছাড়াও অন্য রাজ্যের পলি উমড়িগড়, বিজয় মার্চেন্টের মত বিখ্যাত ব্যক্তিরা মাঠে উপস্থিত হয়ে মেয়েদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। বম্বে হায়দ্রাবাদ তামিলনাড়ু ইত্যাদি জায়গায় লীগ ও নক আউট প্রচুর হওয়ায় ওখানে এখন প্রচুর প্র্যাকটিশ হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই ওখানকার মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলার খেলোয়াড়দের মতে লোকাল লীগ বেশি হলে তারা যে কোন দলের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা রাখে। একটা সময় ছিল যখন অন্যান্য রাজ্যের মেয়েরা বাংলা দলকে ভয় পেত। তাছাড়া অন্যান্য রাজ্যের বড় বড় টেস্ট ম্যাচ-গুলো দেখবার জন্য মেয়েরা ফ্রী টিকিট পায়। কিন্তু এখানে সি. এ. বি. থেকে মাত্র ৫০টা টিকিট মহিলা ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া হয়, সেটাও টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এই ৫০টি টিকিট কাকে ছেড়ে কাকে দেওয়া হবে তা নিয়েও কর্মকর্তা ও ক্লাবগুলোর মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়। খেলোয়াড়রাও ভালো খেলা দেখা ও তা থেকে কিছু শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তবুও মেয়েরা এসব ঝামেলা সহ্য করেই খেলে যাচ্ছিল। কিন্তু এই মামলার পর থেকে সমস্তই বন্ধ হয়ে আছে। স্পেসাল অফিসার এখন অবধি নির্বাচন ডেকে নতুন বডি গঠন করেননি যার ফলে খেলাও শুরু হতে পারেনি। স্বভাবতই মেয়েরা হতাশ হয়ে গেছে এবং নতুন মেয়েদের আগ্রহে ভাঁটা পড়ে গেছে। সম্মিলিত এ্যাথলেটিক ক্লাবের দিলীপবাবুর মতে যে সমস্ত মেয়েরা বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখছে তাদেরকে সরকার এবং বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা থেকে যদি চাকরীর সুযোগ দেওয়া হয় তবে প্রচুর মেয়ে এই খেলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে। তাছাড়া মেয়েদের খেলার ব্যাপারে প্রচারটাও দরকার। প্রচার ঠিকমত হলে অনেকেই এই খেলা দেখবেন। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা যায়। সি. এ. বি-র কাছে টাকা চাওয়া যেতে পারে তাছাড়া প্রতিবছর সৃভ্যেনির করে বা কোন অনুষ্ঠান করে টাকা তোলার ব্যবস্থা করা যায়। কলকাতার বাইরে দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ইত্যাদি জায়গাতে প্রতিবছর প্রদর্শনী ম্যাচ করেও আর্থিক ব্যাপারটা সামলানো যায়। অন্যদিকে কর্মকর্তারা বলছেন তাঁরা সি. এ. বি. থেকে শুরু করে সবার কাছেই টাকা চেয়েছেন এবং অনেক ঝামেলা সহ্য করে টাকা সংগ্রহ করেছেন। নিজেদের পয়সা খরচা করে মেয়েদের টিফিন জুগিয়েছেন। বাংলা যে সাতবার চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে সেটা তাদেরই পরিশ্রমের ফসল। এদের

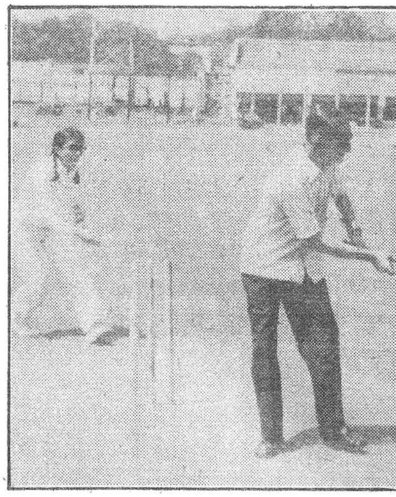

একই খেলাতে কার্তিক বসু প্র্যাকটিশ করাচ্ছেন

আরও বক্তব্য ক্লাবগুলো অনেক কিছুই বলে থাকেন কিন্তু সত্যিকারের দায়িত্ব কজন নিতে চাইবে?

খেলোয়াড়রা এসব তর্কবিতর্কের আর্বতে না জড়িয়ে শুধুই খেলতে চান। এঁদের কাছে তাদের আবেদন শুধু খেলার ব্যবস্থাটুকু করে দিতে। তাদের অভিযোগ ও ক্ষোভ, যে বাংলার মেয়েরা বাংলা মহিলা ক্রিকেটকে উচ্চ শিখরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল আজ সেই বাংলার মেয়েরাই এভাবে খেলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কেন? □

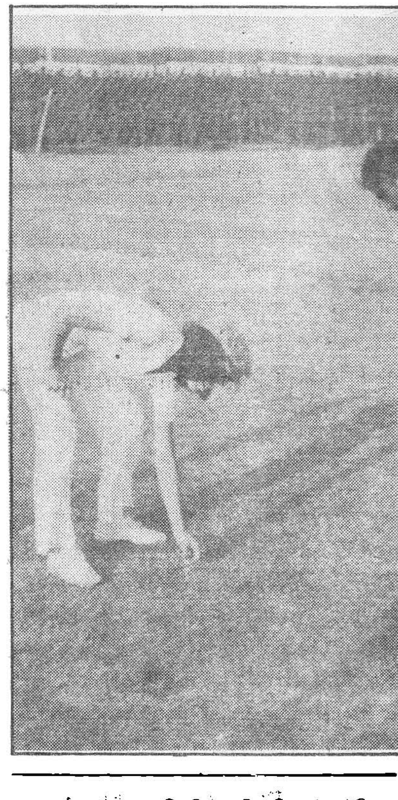

মোহন বাগান ও সম্মিলিত পরিচালিত অল ইন্ডিয়া সিঙ্গল উইকেটে টস্ করছে বম্বের ডায়না এডুলজি ও কর্ণাটকের সুধা সাহ

নকশাল আন্দোলন ও বিদেশী অর্থ

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

১৯৮৪ সালের ২৮ থেকে ৩০শে আগস্ট নকশালবাড়ীতে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)-র অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি নেতৃত্ব দলের এক বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করে সন্তোষ রানাকে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। ঠিক এর আগে ২৬-২৭শে আগস্ট প্রয়াত সত্যনারায়ণ সিং ও তাঁর সমর্থকদের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্তোষ রাণা, ভাস্কর নন্দী ও তাঁদের সমর্থকদের দল থেকে বিতাড়ন করা হয়। সত্যনারয়ণ সিং গোষ্ঠীর সম্মেলনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাস্কর নন্দী ও সন্তোষ রাণার বিরুদ্ধে প্রয়াত সত্যনারায়ণ সিং সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট সংস্থার বিদেশী অর্থ গ্রহণ নৈতিক চরিত্রের পতন সহ একাধিক রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কথা ঘোষণা করেন।

সত্যনারায়ণ সিং গোষ্ঠীর অভিযোগ ছিল, সন্তোষ রানা ভাস্কর নন্দীরা টেগোর সোসাইটির মত সংস্থা, যাঁরা বিদেশী অর্থে পান তাঁদের কাছ থেকে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ও বিহারের বহড়াগড়ায় ত্রাণ কাজের নামে টাকা নিয়েছেন। তাছাড়া ডেনমার্কের একটি সংগঠন "ডেভলাপমেন্ট এইড ফ্রম পিপল টু পিপল" নামে একটি সংগঠন, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট তাঁদের কাছ থেকে নন্দী-রাণা গোষ্ঠী টাকা নিয়েছেন।

১৯৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর সি. পি. আই. (এম. এল.) অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সত্যনারায়ণ সিং ভাস্কর নন্দী ও সন্তোষ রাণার বিরুদ্ধে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের এক দীর্ঘ পত্র দেন। ঐ পত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী অর্থ গ্রহণ ও স্তালিন ফ্যাসিস্ত, খুনী ছিলেন প্রভৃতি কমিউনিস্ট বিরোধী লাইন গ্রহণের অভিযোগ তোলেন। সত্যনারায়ণবাবু ঐ পত্রে বলেন, ভাস্কর নন্দীর সঙ্গে ইফ্টুর সম্পাদক ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবনাথনের স্ত্রী বাসন্তীর অবৈধ সম্পর্ক এবং সন্তোষ রাণার সঙ্গে জনৈক প্রয়াত পার্টি কমরেডের বিধবা বোনের অবৈধ সম্পর্কে আপত্তিজনক কমিউনিস্ট শিষ্টাচার বিরোধী। 'Our Differences with Nundy-Rana Grouph' নামে রাজনৈতিক দলিলে এস. এন. এসের এই চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে।

সত্যনারায়ণ সিং-এর ঐ চিঠিতে অভিযোগ করা হয়, ঝাড়গ্রাম ও বহড়াগড়ায় ত্রাণ কাজের নামে দলের পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির অগোচরে টেগোর-সোসাইটির টাকা নেওয়া হয়েছে, টেগোর সোসাইটি 'বিদেশী অর্থ' নিয়ে থাকেন। একই ভাবে বিহারে ডেনমার্ক ও সুইডেনের দুটি সংস্থা, যাঁদের পেছনে সি. আই. এ., মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আছে তাদের অর্থ নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে সি. বি. আই. ও আই. বি.র তদন্ত হয়েছে, হচ্ছে। এতে দলের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সন্তোষ রাণা ভাস্কর নন্দীরা অবশ্য সত্যনারায়ণ সিং ও তাঁর সমর্থকদের সমস্ত অভিযোগই উড়িয়ে দেন। তাঁদের মুখপত্র 'ফর এ নিউ ডেমোক্র্যাসি'-তে সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথ থেকে গোষ্ঠীর সরে এন এন যাওয়া ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিপদকে খাটো করে দেখার অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এটা সত্যি যে ঝাড়গ্রাম ও বহড়াগড়ায় ত্রাণ কাজের জন্য টেগোর সোসাইটির টাকা তিনি ও তাঁর সমর্থকেরা নিয়েছেন। ১৯৮৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর টেগোর সোসাইটির যুগ্ম-সম্পাদক এস. কে. চক্রবর্তী 'গোপীবল্লভপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' বহড়াগড়ার 'জগন্নাথপুর মহিলা সমিতি'কে দেওয়া যথাক্রমে ৬০ হাজার ও ৪০ হাজার টাকার হিসাব দাখিলের জন্য সন্তোষ রাণাকে দুটি পৃথক চিঠি পাঠান। ঐ চিঠিতে শ্রী চক্রবর্তী জানান, 'ফরেন কন্ট্রিবিউসন এ্যাক্ট ১৯৭৬' মত তাঁদের ভারত সরকারকে সব হিসাব দিতে হবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল স্তালিন, নৈতিক চরিত্র, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিপদ, বিদেশী অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে রাণা-নন্দী গোষ্ঠীর বক্তব্য বেশ গোলমেলে। ভাস্কর নন্দীর মতে স্তালিন কমিউনিস্টদের হত্যাকারী ছিলেন তবে তাঁর ৩০% নীতি সমর্থনযোগ্য, ৭০ % অসমর্থনযোগ্য। তাঁর সঙ্গে বাসন্তীর সম্পর্কের বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বৈঠকে এস. এন. এস. গোষ্ঠীর চাপের কাছে শুধু নন্দী বলেন, তাঁরা বন্ধু। দেবনাথন জানান, বাসন্তীর সঙ্গে তিনবছর তাঁর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেই, নন্দীর সঙ্গে বাসন্তীর সম্পর্কে তাঁর কোন আপত্তি নেই। এস. এন. এস. গোষ্ঠীর দাবি ছিল, নন্দীকে প্রকাশ্যে বাসন্তীকে বিবাহ করতে হবে। সন্তোষ রাণাকে জয়শ্রী রাণাকে ডিভোর্স করে ঐ বিধবা মহিলাকে বিবাহ করতে হবে।

এস. এন. এস. গোষ্ঠীর এই সব অভিযোগ নিয়ে সন্তোষ রাণার বক্তব্য জানতে ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে ৮ বি পাম প্রেসে সন্তোষবাবুদের নয়া দপ্তরে উপস্থিত হই। সন্তোষবাবু দীর্ঘক্ষণ তাঁর বক্তব্য একের পর এক বলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্যই এস. এন. এস. গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ও তার পরিণতিতে ওঁদের দল থেকে সরে যাওয়া। ঐ গোষ্ঠী সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা শুরু করেন, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বড় বিপদ বলে মনে করা থেকে সরে আসেন এবং 'ইন্দিরা ফ্যাসিবাদে'র বিরুদ্ধে যুক্তমোর্চায় বি. জে. পি, জনতা প্রভৃতিদের সঙ্গে আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। রাজনৈতিক বক্তব্যগুলি তুলে ধরতে না পেরে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও চরিত্র হননের রাজনীতি শুরু করেছেন।

শ্রী রাণা জানান, টেগোর সোসাইটি ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর থানার কটি অঞ্চল খরা কবলিত এলাকায় ত্রাণ কাজের জন্য কিছু কাজ করেন। স্থানীয় এম এল এ হিসাবে আমি সেগুলো সুপারিশ করি। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আমাদের সি পি আই (এম এল) নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতগুলিকে অসহযোগিতা করেন, ত্রাণের কাজ বন্ধ করেন। তখন টেগোর সোসাইটির শ্রী এস কে চক্রবর্তী আমাকে ঐ অঞ্চলে ত্রাণের কাজ করার আগ্রহ দেখান আমি তা অনুমোদন করি এবং আমাদের দলের জেলা সম্পাদক পৃথ্বিরাজ দাশগুপ্তের (যিনি দলের ভাঙনের পর বিরোধী গোষ্ঠীতে আছেন) সঙ্গে কথা বলি। কাজেই এতে গোপনীয়তার কি আছে? যাঁরা আমার বিরুদ্ধে এসব নিয়ে কুৎসা রটাচ্ছেন তাঁরা ত দলের রাজ্য কমিটিতে মোট ১৫ জনের মধ্যে ৯ জন অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা এ ব্যাপারে আপত্তি তোলেন নি কেন? তাঁর মতে টেগোর সোসাইটির টাকা বিদেশী অর্থ না এতে সি আই এর মদত আছে তা সাধন সরকার সৈফুদ্দিনরাই ভালো বলতে পারবেন। পঃবঙ্গে বামফ্রন্ট গোপীবল্লভপুরে টেগোর সোসাইটির কাজে বাধা সৃষ্টি করলে আমরা বিহারের বহড়াগড়ায় টেগোর সোসাইটিকে ত্রাণ কাজ করতে বলি এবং তাঁরা মেয়েদের সেলাই কল দিয়ে ট্রেনিং সেন্টার চালু করেন। ডেনমার্কের সংস্থা হল 'ডেভলাপমেন্ট এড ফর পিপল টু পিপল' একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংস্থা। এঁরা মার্কিন

তৃতীয় জোট এস. ইউ. সি. ?

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘদিনের বামপন্থী দলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন এস. ইউ. সি নেতৃত্ব একক সংগ্রামে কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? এস. ইউ. সি রাজ্য নেতৃত্বের সাম্প্রতিক উদ্যোগে সেই কথাই মনে হচ্ছে। বি. জে. পি জনতার মত দলকে যাঁরা 'বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থী' বলে সংস্পর্শে আসতে অরাজী ছিলেন সেই 'বুর্জোয়া' দলগুলির সঙ্গেও এস. ইউ. সি. এখন 'ফ্যাসিবাদে'র বিপদের বিরুদ্ধে যুক্ত কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগ্রাম চাইছেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় এস. ইউ. সি. অফিসে অ-বামফ্রন্ট অ-কংগ্রেসী দলের বৈঠকের উদ্যোগ নেন এস. ইউ. সি.। বি. জে. পি, জনতা, সি. পি. আই. (এম. এল.) সন্তোষ রানা গোষ্ঠী, কানু সান্যালের ও. সি. সি. আর, প্রভৃতি দলের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিত দলের মধ্যে ছিলেন ইন্ডিয়ান পিপিলস্ ফ্রন্ট ও মার্কসবাদী ঐক্য কেন্দ্র। এঁদের মধ্যে জনতা ও বি. জে. পি. ছাড়া বাকী গোষ্ঠীরা বামপন্থী এবং মার্কসবাদীদের দাবি করে থাকেন।

পঃ বঙ্গে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস বিরোধী তৃতীয় রাজনৈতিক জোট গঠনের তৎপরতা নূতন নয়। এর আগে ১৯৮৩ সালে বামফ্রন্ট সরকারের ট্রাম বাস ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, পরে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে অ-কংগ্রেসী, বামফ্রন্ট বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করেন। জনতা, বি. জে. পি, সি. পি. আই. (এম. এল.) ও. সি. সি. আর মার্কসবাদী ঐক্য কেন্দ্র 'গণ সংঘর্ষ সমিতি' নামে এক রাজনৈতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। বর্তমানে রাজ্য-জনতার সভাপতি স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য ও সি. পি. আই. (এম. এল.) সত্যনারায়ন সিং গোষ্ঠীর সাধন সরকার হন যুগ্ম-আহ্বায়ক। এই সময়ে এই দুই নেতার সঙ্গে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী চেষ্টা করেছিলেন এস. ইউ. সি.কে আনতে। এমনকি এজন্য তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের মত ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। কিন্তু এস. ইউ. সি. সেদিন 'বুর্জোয়া' দলগুলির সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করেন। বিগত লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে এক তৃতীয় রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলার নয়া উদ্যোগ শুরু হয়। এস. ইউ. সি.র নীতির এই সময় কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। বি. জে. পি, জনতা সমেত বিভিন্ন কংগ্রেস বিরোধী দলের নেতাদের তাঁরা 'ফ্যাসিবাদের বিপদে'র বিরুদ্ধে যুক্ত কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলনের প্রস্তাব দেন।

এই নিয়ে কয়েকটি বৈঠকও হয়। নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এস. ইউ. সি. এককভাবে নির্বাচনে নামার সিদ্ধান্ত নেন এবং 'বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থী' বিরোধী দল বি. জে. পি. জনতার সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করেন। বি. জে. পি. জনতা সি. পি. আই. (এম. এল.) সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচন লড়াই-এ নামেন। কিন্তু এস. ইউ. সি. তখন জোট বাঁধতে রাজী হয়নি।

এস. ইউ. সি.র নয়া রাজনৈতিক মোর্চা বা যুক্ত আন্দোলনের পর্বের সূচনা হয় কুলতলী হত্যাকান্ডের পর। দুজন কংগ্রেস সমর্থক নিহত হবার পর এস. ইউ. সি.র শক্ত ঘাঁটি জয়নগর মথুরাপুর কুলতলিতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক চাপ বাড়ে। এস. ইউ. সি.র অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের নেতৃত্বে

সাম্রাজ্যবাদীদের একটি পয়সাও পান না। এঁরা বিহারের রোটাস জেলায় ভাবুয়ায় হরিজন ছেলেদের শিক্ষা দিতে একটি স্কুল তৈরী করেন। এই সংগঠনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই। 'সোয়াপোর' (সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা পিপিলস অর্গানিজেশান) মত ঔপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ বিরোধী সংস্থা কে. ডি. এ. পি. পি. সাহায্য দেয়।

সন্তোষ বাবু বিরোধী গোষ্ঠীর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অগোচরে কখনই এসব ঘটেনি। আমরা যদি 'মার্কিনপন্থী' হই তবে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ইউনিয়ান কারবাইডের বিরুদ্ধে ভূপালের বিষাক্তগ্যাস ইসুতে লড়াই করছি কি করে? এদিকে সত্যনারায়ণ সিং গোষ্ঠীর অভিযোগ, সন্তোষ রাণা ভাস্কর নন্দীরা 'বেনামে' একটি পর্যটন সংস্থা খুলেছেন। এতে সন্তোষবাবুর মা ভাস্কর বাবুর বোন, অলক মুখার্জির বোন প্রভৃতিরা আছেন। এই পর্যটন সংস্থা বিভিন্ন বিদেশীদের। এদের মধ্যে আমেরিকানরাও আছেন তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে দেখান। এস এন এস গোষ্ঠীর মতে, এই সংস্থাটি একটি সন্দেহজনক সংস্থা। অথচ সন্তোষবাবু এই 'পর্যটন সংস্থা'র কথা সাফ অস্বীকার করলেন, তিনি জানান এটাও আমাদের বিরুদ্ধে এক কুৎসাপূর্ণ চরিত্রহননের প্রচেষ্টা।

সি. পি. আই. (এম. এল.) অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি এক সময়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঝাড়গ্রাম আন্দোলনের পেছনে দাঁড়ান এবং ঝাড়খন্ডীরা একটি জাতি এই তত্ত্ব খাড়া করেন। পরে সত্যনারায়ণ সিং ও তাঁর সমর্থকরা এই তত্ত্ব এবং এই আন্দোলনের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্যাথলিক চার্চের মদতের অভিযোগ আনেন। সন্তোষ রাণা এই অভিযোগ সম্পর্কে বলেন এগুলো সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালালরাই বলবেন। ঝাড়খন্ডের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব জাতি সত্ত্বা আছে। ঝাড়খন্ডী আদিবাসীরা আমাদের দেশের উচ্চবর্ণের মানুষদের সাঁমন্ততান্ত্রিক শোষণের বলি, তাই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই এই সব কুৎসা রটাচ্ছেন। খৃষ্টান চার্চের মদত যদি ঝাড়খন্ডীরা নিয়ে থাকবে তবে সাম্প্রতিক লোকসভার নির্বাচনে এন. কে. হোরো কে হারাতে ক্যাথলিক চার্চ কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দেবার প্রকাশ্য আবেদন জানালেন কেন?

যাই হোক, নকশালপন্থী গোষ্ঠীদের মধ্যে এসব বিরোধ রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রশ্নের বাইরে এখন বিদেশী অর্থ, নৈতিকচরিত্র ও সোভিয়েট বিরোধিতার নামে মার্কিন সাহায্য লাভ প্রভৃতি অভিযোগ বড় হয়ে উঠেছে। সি. পি. আই. (এম এল) অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটিতে সত্যনারায়ণ সিং সমর্থক ও ভাস্কর নন্দী-সন্তোষ রাণার সমর্থকদের সাম্প্রতিক বিরোধে রাজনৈতিক বিরোধ ছাপিয়ে এক ব্যক্তিগত আক্রমণ চরিত্রহননের পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। যদিও সন্তোষবাবু ব্যক্তিগতভাবে এস. এন. এস গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শুধু রাজনৈতিক প্রশ্নই তুলে ধরে। সাধন সরকার সৈফুদ্দিন প্রমুখদের বিরুদ্ধে একটিও ব্যক্তিগত অভিযোগ তোলেন নি। □

এক সত্যানুসন্ধান দল কুলতলির রাধাবল্লভপুরে যান। জনতা, বি. জে. পি, সি. পি. আই. (এম. এল.) সন্তোষ রানা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও ওখানে যান। এঁদের ফিরে আসার পর সাংবাদিক সম্মেলনে দেওয়া তথ্য ও বক্তব্য এস. ইউ. সি. কে রাজনৈতিক ভাবে সাহায্য করে। কংগ্রেসের দুজন সমর্থকের হত্যাকান্ড সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত এই অভিযোগ দ্বিজেনবাবুরা অস্বীকার করেন। পরে দ্বিজেনবাবুর অনুরোধে এস. ইউ. সি. জনতা নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এক তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি গড়ার প্রয়াস শুরু হয়। কুলতলীর ঘটনার পর এস. ইউ. সি. রাজ্যে নবপর্যায়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক মোর্চা গঠনের জন্য উদ্যোগী হন। ১৯ ফেব্রুয়ারী তাঁদের আহূত বৈঠকে জনতা প্রতিনিধি ডাঃ সন্মথ ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, অতীতের মত আবার আপনারা এই উদ্যোগে থেকে সরে যাবেন না তো? ট্রাম বাস ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন সহ বিভিন্ন প্রশ্নে এস. ইউ. সি.র সংকীর্ণ একক রাজনৈতিক লাইন এঁরা ভোলেননি। তৃতীয় রাজনৈতিক মোর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট সংশয়ের কারণ আছে। বি. জে. পি. ও জনতা দু দলেই হিংসায় বিশ্বাসী মার্কসবাদী দল বা গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের প্রশ্নে দ্বিধা আছে। জনতার অনেক নেতাই নকশাল গোষ্ঠীগুলি বা এস. ইউ. সি.র সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে। বি. জে. পি.তেও এই প্রশ্নে মতভেদ আছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা এস. ইউ. সি. রাজনৈতিক বিপাকে পড়েছেন কুলতলি নিয়ে, তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই এই তৃতীয় মোর্চার প্রচেষ্টা করছেন। তাই গণসংঘর্ষ সমিতি ধরনের অ-কংগ্রেসী বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তি জোটের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় রয়েছে। □

ডান দিক থেকে

১. মনোহর চক্রবর্তী
২. সাধন সরকার
৩. দিলীপ চক্রবর্তী
৪. সুকুমার ব্যানার্জ্জী
৫. সত্যনারায়ন সিং
৬. অশোক দাশগুপ্ত
৭. মানিক মুখার্জ্জী
৮. পিয়ুষ দে (ও-সি-সি-আর)
৯. সুধীর ভট্টাচার্য (সি-ইউ-সি)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

BHARAT PAINT INDUSTRIES

Basudebpur, P.O. Khanjanchak, Haldia
Midnapur, Pin Code No. 721602 Phone 2171

Manufacturers of paints,
varnishes & Thinners.

ধারাবাহিক

নূপুরের মতো

অনুলিখন ঃ অনুপমা দাশ

বিশ

প্রথমতঃ প্রাচ্য চিত্রকলা ভবনে উদয়শঙ্কর শুধু নৃত্যই করলো না, তার মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, তার দেহের রেখায়-রেখায় গতির সুষমাময় ছন্দ, তার চাউনি, তার ভঙ্গী নৃত্য রস প্রবাহিত করে দিয়ে গেল দর্শকদের মনে।

এ শুধু একটি মানুষের ক্ষণিক নৃত্য নয়, উদয়শঙ্করের চোখের তারায় তারায় তার পদক্ষেপের ছন্দে-ছন্দে স্পষ্ট ধ্বনিত হচ্ছে বিদ্রোহের সুর—ফুটে উঠছে নতুন নৃত্যালোক সৃষ্টির আভাস। প্রাচীন মন্দির গাত্রের এক একটি মূর্তি, অবনীন্দ্রনাথের দুর্লভ এক একটি চিত্র যেন সহসা প্রাণ পেয়ে গতিময় হয়ে উঠেছে প্রাচ্য চিত্রকলা ভবনের মঞ্চের উপর।...

.... উদয়শঙ্করকে অল্পকাল মাত্র দেখেই প্রাচ্য চিত্রকলা ভবনের বহু বিদগ্ধ দর্শকদের মনে সেদিন এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল যে, অবহেলিত ভারতের নৃত্য-কলা লক্ষ্মীর বন্ধন মোচ করে জগত সভায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যেন একমাত্র উদয়শঙ্করের পক্ষেই সম্ভব।"

—এই হলো সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণ ছবি।

তারপর সেই অনুষ্ঠানের পর কি হলো জিজ্ঞাসা করাতে দাদা বললেন—

"অনুষ্ঠানের সফলতার পর হরেন ঘোষ নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে টানা সাতদিন আমার নাচের ব্যবস্থা করলেন। সে সময় ব্রিটিশরা দাবী করতো যে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাল থিয়েটার এবং সেই জন্য সেটা তাদের একচেটিয়া করে রেখেছিল ব্রিটিশরা। শুনেছি, নাকি ভারতবর্ষীয় কোন শিল্পী তখন পর্যন্ত নিউএম্পায়ারে কোন অনুষ্ঠান করার অনুমতি পাননি। এবাধাটিকে জয় করা হলো। শুধু তাই নয়, তখনকার দিনের ইংরেজরা থিয়েটারটির অনেকাংশ জুড়েই উপস্থিত ছিলেন আমার সেই শো দেখবার জন্য।

নিউ এম্পায়ারে শো হবে টিকিট বিক্রি করে। কাজেই বিক্রি শুরু হলো—। এখন হয়েছে কি—সে সময়ে টিকিটে নম্বর দিয়ে আসন সংখ্যা অনুযায়ী বিক্রি করা, এসব ব্যাপারে ভালমত রপ্ত হয়নি আমাদের দেশের লোক। দোষ লোকদের নয়, আসলে কোন নাচের অনুষ্ঠানের জন্য অত টিকিট বিক্রি হতে পারে একথা কেউ কল্পনা করতে পারেননি বা সেসব চিন্তা করার মত কোন সুযোগ ও অভিজ্ঞতাও তাদের এর আগে আসেনি। তাই টিকিট ছাপা হয়েছে এবং বিক্রিও হয়েছে, যেই সেগুলি শেষ হলো আবার নতুন টিকিট ছাপিয়ে এসে গেল—এমনিভাবে চলেছে, কিন্তু কোথায় যে তাদের বসতে দেবে তা ভাবছে না। শেষ পর্যন্ত আসন ভর্তি হয়ে গেলে সিঁড়িতে বসেও দর্শকরা দেখেছেন এবং হরেনবাবুর কাছে শুনেছিলাম অনেক দর্শক টিকিট কেটে দরজার ওপাশ থেকে শুধু মিউজিক শুনেই ফিরে গেছেন। থিয়েটারে তিল ধারণের জায়গা নেই। সাতদিনই এক অবস্থা। সেই শো-এর আর্থিক সফলতা প্রচন্ড হয়েছিল সন্দেহ নাই। হরেনবাবু তাঁর পাওনা টাকা ফিরে পেয়েছিলেন এবং সবথেকে লাভবান হয়েছিল থিয়েটারের তহবিল।"

এইখানে আমি একটি ছোট অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। দাদার নাচের এসব গল্প রূপকথার মতই লাগে আমার কাছে। কিছুদিন আগে দাদার সঙ্গেই আমি নিউএম্পায়ার সিনেমাহলে কোন এক বিখ্যাত সিনেমা দেখতে যাই। এই সিনেমা হলটিই ছিল তখনকার দিনের নিউ এম্পায়ার থিয়েটার।

দাদাকে ঢুকতে দেখেই ওখানকার পুরাতন কর্মচারীরা কি ভক্তিভরে নমস্কার বা সেলাম করলে তা দেখে আমি অবাক। তাদের এই ভক্তির কারণটা আমি তখনও বুঝতে পারিনি। সিনেমা শেষ হলে বাইরে এসে লক্ষ্য করলাম সেই পুরাতন গুটিকয়েক কর্মচারী, সদ্য আসা নতুন কর্মচারীদেরকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। দাদাকে আবার তারা অমনিভাবে নমস্কার ও সেলাম করলে। তারপর শুনতে পেলাম তারা নতুনদের উদ্দেশ করে বলছে,—'আরে ভাই, জানো, উনি উদয়শঙ্কর! ওঁর জন্য এই থিয়েটার লাল হয়ে গিয়েছে। কত লক্ষ টাকা উনি এনে দিয়েছেন এই থিয়েটারকে।'

দাদা খেয়াল করেননি এসব আলোচনা কিন্তু আমার কানে গিয়েছিল। তাই পরে দাদাকে বললাম সে সব কথা। শুনে তিনি শুধু হাসলেন এক শান্ত হাসি, আমাদের তিয়াত্তর বছরের দাদা।

যাক, তেতাল্লিশ বছরের আগের কথায় ফিরে যাই। হরেনবাবু দাদাকে লুকিয়ে, এক রকম ঢেকে কোথা দিয়ে ঘুরে পিছনের দরজা দিয়ে স্টেজে নিয়ে যেতেন। শোয়ের ক'দিনই তাঁকে এই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তাছাড়া তিনি দাদাকে অন্যসময় একলা বেরোতেও বারণ করেছিলেন। কেননা, কিড়ন্যাপিং এর ভয় ছিল। হরেনবাবুর এই আশঙ্কায় দাদা খুব হেসেছিলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর নাচ দেখবার জন্য কত কষ্ট করে, কত উৎসাহ নিয়ে দর্শকরা আসছেন, তখন কৃতজ্ঞতায় তাদের উদ্দেশে দাদার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠেছিল। কেননা ভিড় সামলানোর জন্য মাউন্টেড পুলিশকে আসতে হয়েছিল, নিউ এম্পায়ারের বক্স অফিস তছনছ হয়ে গিয়েছিল।

নিউ এম্পায়ারের শোয়ের কথায় দাদা অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর কয়েকজন হিতাকাঙ্খী দরদী বন্ধুর কথা মনে পড়ে। দাদা বল্লেন, 'সেবারের শোয় আমি একা-একা নাচ করছিলাম, কোন পার্টনার নয়, কেউ না। তাই কসটিউম বদল করার সময় কি হবে, কি করে সময় পাবো? এগিয়ে এলেন অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মণ, প্রমথেশ বড়ুয়া, তিমিরবরণ ও তার পরিবার।'

এঁরা কী অদ্ভুত লোক! এঁরা এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্য। আমার এক একটি নাচের ফাঁকে গান গেয়ে অভিনয়াংশ পরিবেশন করে, অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করে দর্শকদের ব্যস্ত রাখতেন। আর সেই সময় আমি পোশাক পাল্‌টে নিতাম।

কোনরকম পয়সা-কড়ির সম্বন্ধ নয়, শুধুমাত্র মনের আবেগে তাঁরা আমার জন্য এগিয়ে এলেন। এঁদের মত মন-প্রাণও আর্টিস্টের যোগ্যতা আমি খুব কম দেখেছি এদেশে। তাঁদের সেই নিঃস্বার্থ ব্যবহারের যথার্থ মূল্যায়ণ আমি কী দিয়ে করবো—আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ছাড়া। তাঁরা বললেন, 'তুমি কিছু ভেবো না, তুমি শুধু নাচ করে, যাও, আমরা সহযোগিতা করবো তোমার সঙ্গে।' তাঁদের সেই নিবিড় আন্তরিক আলিঙ্গন আমি আজও অনুভব করি।

এমনিভাবে শেষ হলো সাতদিনের অনুষ্ঠান। এবার আমাদের বিদেশ যাত্রার আয়োজনটুকু শেষ করে ফেলতে হবে। সেসময় মনের মধ্যে একটা দায়িত্ব, একটা আনন্দ, একটা অদম্য উৎসাহ অনুভব করতাম। কাজ করবো, নতুন-নতুন সৃষ্টির আনন্দ, আরো কাজ করার ইচ্ছা যেন দপ্-দপ্ করে জ্বলতো মনের মধ্যে।

অবশেষে আমরা উঠলাম জাহাজে, আমার প্রথম ট্রুপ নিয়ে। সকলের মন খুশি।

প্রায় পনেরো দিন বাদে 'দিগ্যাঞ্জেস' এসে পৌঁছালো মার্সেলেন বন্দরে। দশ বছর আগে

এইখানেই নোঙর করেছিল এস. এস. লয়্যালটি আমাকে নিয়ে। ভীষণ উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কোন রকমে প্রাণ হাতে নিয়ে সেদিন এসেছিলাম। সেবার এসে সব নতুনের মাঝে নিজেকে দিশেহারা লেগেছিল। আর এবার যে কতো পরিচিত জায়গায় এলাম। বাস্তবিক প্যারিস আমার কাছে হয়ে গিয়েছিল নিজের দেশের মত। প্যারিসেই আমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, নাম করেছি। সব অবস্থাতেই এই প্যারিস তার প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে আমায় উৎসাহ দিয়েছে। প্যারিসে না এসে আমি যদি ইংলন্ডেই থেকে যেতাম, তাহলে কি হতো জানি না। তবে আজ যা হতে পেরেছি তা সম্ভব হতো না। শুধু আমার বেলায় নয়, প্যারিসের বিশেষত্বই এই। যে কোন স্তরের শিল্পীদেরই এখানে ভরসা আছে, নিজেদের উপস্থাপনের ব্যবস্থা আছে। আর যোগ্যতা থাকলে, প্রতিভা থাকলে একের পর এক স্তর পেরিয়ে সে পেতে পারে প্রতিষ্ঠা এই শহরে। আর প্যারিস থাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দেয়, ইউরোপ তাকে গ্রহণ করবেই।

প্যারিসের মত আর্ট কালচারের পরিপোষক শহর আর দুনিয়ায় নেই। কত বিদেশি শিল্পী প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এই প্যারিসে এসেই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কৃতজ্ঞ প্যারিসের কাছে। তাই দেশে-দেশে শো দিয়ে বেড়ালেও প্যারিসেই ছিল আমার কেন্দ্র বা বাড়ি। তাই এদের নিয়ে প্রথমে প্যারিসেই এলাম। আমার পরিকল্পনা মত সিমৃকী রু দি প্যারীর উপর এক দোতলা বাড়ি ঠিক করে রেখেছিল।

একতলায় বড় হলঘর আছে। সেইখানেই সব ইনস্ট্রুমেন্ট রাখা হলো। এই ঘরেই হতো আমাদের রিহার্সাল। বলতে গেলে সারা দিনই চলতো রিহার্সাল।

শিরালীও এসে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। তিমিরের উপর দায়িত্ব ছিল সংগীত পরিচালনার। আমি যেমন চাইতাম, ঠিক তাই ও করে দিত। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আমার মনের ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে এই সুযোগ্য সংগীত পরিচালকটি আমায় সহযোগিতা করেছেন।

কণকলতা, রাজু, দেবু ডান্সার হিসাবে কাঁচা, কিন্তু তাই দিয়েই দীর্ঘদিন রিহার্সালের ফলে তৈরি হলো আমার ট্রুপ। ধীরে ধীরে তাদের এত উন্নতি হলো যে শোয়ের জন্য তারা অপরিহার্য হয়ে উঠলো।

পুরো প্রোগ্রাম তৈরি হলো আমাদের ঘণ্টা দু'আড়াইয়ের মত।

এক এজেন্টের মারফৎ আমাদের শো ঠিক হলো গ্রান্ড সাঁজ লিজে থিয়েটারে। নিজের ট্রুপের সঙ্গে সেই আমার প্রথম অনুষ্ঠান। দিনটা ছিল উনিশশো একত্রিশ সালের তিন মার্চ।

মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা পুরো দলকে কিভাবে নেবেন দর্শক সাধারণ!

আমি যখন একটা শো করেছি তখন আমারই দেওয়া সুর বাজানো হতো পিয়ানোয়, বা ওদেশের অর্কেস্ট্রায়। কেননা ভারতীয় যন্ত্র ও যন্ত্রী তখন ছিল না। কিন্তু এবার সব কিছু ভারতীয়,—কসটিউম, সুর, বাদ্যযন্ত্র, ও শিল্পীরা—সবাই ভারতীয়। সিমৃকী ভারতীয় না হলেও ওর ভাব-ভঙ্গি যেকোন ভারতীয় মেয়ের শেখবার বিষয়। কাজেই এবারের শোয়ের একটা আলাদা মর্যাদা। শোয়ের আগের দিনই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। দাঁড়াবার বা বসবার কোন জায়গা নাকি খালি নেই। তবু লোক আসছে, প্রচন্ড ভীড় থিয়েটারের সামনে। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে হাজার দুয়েক লোক মরিয়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে কারও বা পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ উধাও হচ্ছে, কারও বা এটা হারাচ্ছে—ওটা হারাচ্ছে। আর তার সঙ্গে টিকিটের হাহাকার,—বক্স অফিস ভাঙার উপক্রম। মহিলারা ভিড়ের চাপে অতিষ্ঠ—তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। প্যারিস শহরে বড় থিয়েটারে যাবার সময় মহিলারা তাদের সবচেয়ে ভাল পোশাক, ফ্যাসানেবল্ হ্যাট, ইত্যাদি পরতেন, আর পুরুষেরা তাদের পাশে এমনি এক সুসজ্জিতা সুবেশা মহিলাকে নিয়ে গর্ববোধ করেন,—এইটাই প্যারিসের রীতি। কিন্তু সেইদিন সাঁজলিজে থিয়েটারের সামনে দাঁড়ান এমনি সব পুরুষ ও মহিলাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না। খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনীর একটি পুরো ফোর্স ছুটে এলো।

তারা থিয়েটারের ভিতর এসে পরিদর্শন করে গেল, সত্যিই কোন আসন খালি নেই। থিয়েটারের বাইরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারা সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলো, আপনারা দয়া করে ফিরে যান, সত্যিই কোন আসন খালি নেই। এমন কি গ্যালারির সিঁড়িতেও লোক বসে গেছেন।

সেদিন আমাদের শো নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে শুরু হতে পেরেছিল। আর সে শোয়ের কি চমৎকার সাফল্য! সত্যিকথা বলতে কি—এতটা আমি আশা করতে পারিনি।

সেই একদিন শোয়ে সাঁজলিজে কর্তৃপক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক উপার্জন করেছিলেন। তবুও তাঁরা আমাদের কাছে দাখিল করলেন আড়াই হাজার ফ্রাঙ্কের ডেফিসিট, পাবলিসিটি বাবদ।

বিজনেসের এসব কায়দা-কানুন আমার অজানা ছিল। তাই বাধ্য হয়েছিলাম আমরা ঐ আড়াই হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে এবং টাকাটা দিয়েছিলেন আমার নিঃস্বার্থ সুহৃদ শ্রীমতী আলিস বোনার।

সেসময় প্যারিসে কোন বড় কিছু ঘটলে সঙ্গে-সঙ্গেই তা ফলাও করে ছড়িয়ে পড়তো সারা ইউরোপে। কাজেই সাঁজলিজে সেই অসাধারণ সাফল্য আমাদের ট্যুরের পথ সুগম করে দিল।

এরপর চললো একের পর এক শো দেশে-দেশে। এই জীবনটা বড় মজার। সাফল্য, অভিনন্দন আর সমাদর, সেসব ঘটনার বিবরণ আর কি দেবো? তবু একটা আশ্চর্য অনুভূতির কথা বলছি—

আমার দুর্দিনের সময় যে শহরগুলির ক্যাবারেতে শো দিয়ে আমায় পেট চালাতে হয়েছে, তখন সেইসব শহরেই অভিজাত থিয়েটার ও অপেরাতে শো দিয়েই পেতে লাগলাম অর্থ, সম্মান ও অভিনন্দন। আর যত পেয়েছি, ততই ভেবেছি—কী বিচিত্র ভগবানের খেয়াল। আমার এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কী অভিনব এক খেলা তিনি খেলছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

।। এগারো ।।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমি দেখেছিলাম প্রথম আমার চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে।' দাদা বললেন,—'কিন্তু সে ছিল নিতান্তই চোখের দেখা। গাজিপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি। তখন বছর চৌদ্দ বয়স। অস্পষ্ট মনে আছে যে, বড় বাড়িটিতে এক ব্রাহ্মসমাজের সম্মেলন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ শরীর ও সুন্দর চেহারার একটা ভাসা-ভাসা ছবি স্মৃতিপটে আঁকা আছে। তবে গাজিপুরের সেই ড্রয়িং মাস্টার গাইতে শুনেছেন রবীন্দ্রনাথের গান। আবৃত্তি করতে দেখেছেন অনেক কবিতা। তাঁর বিষয়ে অনেক গল্পও শুনেছেন মাস্টারমশায়ের মুখে। আর সেই সব শুনতে-শুনতে কিশোর বয়সেই অজান্তেই সশ্রদ্ধ হয়ে উঠতো তাঁর অন্তর সেই কবিগুরুর প্রতি।'

'রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় তা আজ সারা বিশ্বের লোক জানেন। আমি আর তাঁর বিষয়ে কি বলবো? স্যার রদেনস্টাইন ও মাদাম পাবলোভা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন পথ। আর রবীন্দ্রনাথ

দিয়েছিলেন সেই পথে চলার সঠিক নির্দেশটি।

তারপর রবীন্দ্রনাথকে দেখি লন্ডনে রয়্যাল কলেজ অব আরটে। স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইন পরে আমায় গল্প করেছেন তাঁর বিষয়ে। কিভাবে তাঁর সঙ্গে স্যার রদেনস্টাইনের যোগাযোগ। কিভাবে শান্তিনিকেতনের ভাবধারায় তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার প্রতীকস্বরূপ তিনি এঁকেছিলেন গীতাঞ্জলির প্রচ্ছদপটে কবির মুখটি।

যখন প্যারিসে দু:খদৈন্যের মধ্য দিয়ে আমার দিন কেটেছে, সে সময় আমার স্যুটকেশে রাখা গীতাঞ্জলিখানা হাতে নিয়ে পড়তে-পড়তে কতদিন সময় কেটেছে। একটা ছেলে-মানুষি চিন্তা সে-সময় মাথায় আসতো।'

প্যারিসে বসে যে চিন্তাটা আমার মনে আসতো, সেটা অন্যভাবে আমার পূরণ হলো।

ভারতে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি দার্জিলিংয়ে। মনে আছে—বসবার ঘরের পাশেই একটা ঘর যেখানে উনি পোশাক পরছিলেন। একটা ড্রেসিং টেবিলও ছিল সেখানে। বসবার ঘরে আমি বসে আছি, অন্য ঘরে উনি আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। দুঘরের মাঝে পর্দা একটু একটু ফাঁক হচ্ছে এক-একবার। আমি এঘরে বসে-বসেই তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম। চুল পরিপাটি করে আঁচড়িয়ে আলতো করে টোকা মেরে একটা লক্স কপালের উপর ফেললেন—কী সুন্দর করে, ঠিক যেমনটি তাঁকে মানায় তেমনিভাবে। যখন ওঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন কী যে অপূর্ব দেখাচ্ছিল তাঁকে তা বলবার নয়।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল সে সময়কার সমাজে নাচের আসনটি নিয়ে। নাচকে তার উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করার পিছনে রবীন্দ্রনাথের যে আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে উনি বললেন, 'তুমি করে যাও বাবা, আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার বদলে পেয়েছি লাঞ্ছনা ও কত খারাপ মন্তব্য। বাড়ির মেয়েদের নিয়ে চান করাচ্ছি বলে কত না অপবাদ পেয়েছি। কিন্তু এই সমাজ, এই লোকেরা এতটা বোঝেনা, কত সুন্দর জিনিস এই নৃত্য! সে সব ছেলেমেয়েরা নাচ করছে তাদের জীবনের জন্য, কত ভাল এই জিনিসটি। সকলেই যে জীবনে বড় ডান্সার হবে তা নয়, কিন্তু কোন জিনিস সুন্দর করে ছন্দোবদ্ধ করতে পারাটাও তো বড় কথা। তাই বলি, উদয়, থেম না, করে যাও, এর প্রতিষ্ঠা চাই।'

আমাদের সেই আলোচনায় হরেন ঘোষ

> পূর্ববঙ্গে গেছি সিমকিকে নিয়ে। রাস্তায় ছোটরা বলছে-সিমকি সিমকি নিমকি। সিমকি আমার নিমকি। সিমকি বলে-দাদা, নিমকি কী?
>
> * * *
>
> শংকরের প্রতি ভালোবাসাতেই এই ফরাসি তরুণী হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে।

মশাইও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বসেই ঠিক হলো কবে গুরুদেব আসবেন কলকাতায় আমার শো দেখতে, আর কবেই বা আমরা শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাবো।

সবসুদ্ধ চারবার আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি আমার জীবনে। আর আজ পর্যন্ত দিনে-দিনে তাঁর সম্বন্ধে আমার সশ্রদ্ধ মনটা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

আমার বাংলা ভাষা বলা, লেখা ও বোঝার ক্ষমতা খুবই কম—শব্দগত ভাবে আমি ছাতুবাঙালি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝতে কখনও অসুবিধা হয়নি। ভাবের দিক দিয়ে তা উচ্চস্তরের ঠিকই, তবে সহজ সরলভাবে বলার ধরনটুকু অপূর্ব!

তাঁর 'অবজারভেশন পাওয়ার' বড় তীক্ষ্ণ। যে কোন লোককে বা যে কোন বিষয়কে তিনি যেন এক মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান। তাঁর জ্ঞান, তাঁর লেখার ক্ষমতা সবই তাঁর নিজের ভেতর থেকে পাওয়া। তাঁর যে কোন কথা বা লেখাই যেন বিশ্বের জন্য বিশেষ করে। যখনই কোন রবীন্দ্রসংগীত শুনি, মনে হয়—এ যেন আমার মনের ভাব, আমার মনের কথা। আর তা জানতে পেরেই যেন উনি রচনা করেছেন এই গান। আমি জানি আমার মত এইভাবে হাজার হাজার লোক এই কথাই অনুভব করেন। শুধু তাই নয়, যে প্রেম তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা যেমন মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার ছবি, তেমনি আবার তলিয়ে ভাবলে দেখা যায় যে, প্রেম নিবেদন হয়েছে সেই জগদীশ্বরের পায়ে।

উনিশ শ' তেত্রিশ সাল, ছয় জুলাই, নিউ এম্পায়ারে আমাদের যে শোটি হয়, তাতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। আমার জীবনের সেটা একটা স্মরণীয় দিন।

সেদিন তাঁর শরীর ভাল ছিলনা। তবু তিনি এসেছিলেন, সেটা আমার পরমসৌভাগ্য। গ্যাঙওয়ের মাঝখানে বিশেষ চেয়ারে তাঁর আরামে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়।

শিব-পার্বতী নাচের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। অনুষ্ঠানের শেষে যথারীতি দর্শকমন্ডলীকে নমস্কার করছি,—অডিটরিয়ামে আলো জ্বলছে। দেখতে পেলাম গুরুদেব যেন উঠে এগিয়ে আসছে স্টেজের দিকে। তাঁর হাতে ধরা ফুলের মালা।

একটা আনন্দ, একটা উত্তেজনা, একটা অপূর্ব অনুভূতি যেন শরীরের মধ্যে অনুভব করলাম। আর এক মুহূর্তও দেরি সইছিল না, ফুটলাইট ডিঙিয়ে একলাফে স্টেজের উপর থেকে নেমে এলাম তাঁর কাছে। গুরুদেবকে প্রণাম করতেই তিনি পরিয়ে দিলেন মালাটি।

মালাটিকে আমি নষ্ট হতে দিইনি। শুকিয়ে গেলেও ওটাকে একটা কাচের বাক্স করে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম। ওটা ছিল মাদ্রাজের বাড়িতে। যতদিন শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলাম, ততদিন ওটাকে রক্ষা করেছি। কিন্তু তারপর ওটার কী হবে জানিনা। এ বয়সে আমার জিনিসপত্রগুলি সামলানো উচিত অন্যকারো। কিন্তু সেটাই আমার একমাত্র দুর্ভাগ্য, সে সব সামলানোর মত কেউ নেই। মাদ্রাজের বাড়িতে আমার অনেক দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের সঙ্গে ওটাও পড়ে আছে অবহেলায়। জানিস, অনুপমা, তোর মত উৎসাহী ও খোলামনের কয়েকটি ছেলেমেয়ে আমার দরকার। অবশ্য এই কলকাতায় বসে বসে কি আর করা সম্ভব তোর, একমাত্র আমার মুখে গল্প শোনা ছাড়া? তবুও সৌভাগ্য বলতে হবে যে, সেই মালাটির ছবি আমি তুলে রেখেছিলাম, আর ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে ও ধরনের বেশ কিছু ছবি বেঁচে আছে কোনক্রমে। সেগুলি হয়তো তোর আকাঙ্খা ও কৌতূহল কিছুটা মেটাবে আর এই বইটাতেও কাজে লাগবে।

এরপর শান্তিনিকেতন গেলাম আট জুলাই। উত্তরায়ণের বারান্দায় বসবার ব্যবস্থা হয়েছে, আর বারান্দার দিকে মুখ করে সামনের মাঠে সব ছাত্রছাত্রীর বসবার জায়গা।

সেদিন চোখের সামনে যা দেখেছিলাম তা আমি কোনদিন ভুলবো না। উত্তরায়ণের বারান্দায় উঠতে গেলে সিঁড়ি শেষ হতেই দুটো থাম। একটা থামের সামনে বড় পিতলের ঘড়ায় গোছা করে রজনীগন্ধার লম্বা-লম্বা ডাঁটি ফুলে-ফুলে সাদা হয়েছে তা, আর অন্য থামটার কাছে ধবধবে সাদা পোশাক পরে বসে আছেন গুরুদেব। সে যে কী দৃশ্য, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবো? ফুল সুন্দর, না তিনি সুন্দর? উত্তরায়ণের বারান্দায় দেওয়ালের কাজ ও গঠন এবং এই দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলবো না। সব মিলিয়ে

কী যে চিত্র রচিত হয়েছিল তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। তুলনা নেই তার।

তারপর গুরুদেবের অনুরোধে আমি সেই বারান্দায় নাচ করি। রাত তখন প্রায় দশটা। আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না এই অনুরোধের জন্য। কারণ কসটিউম ও যন্ত্রপাতি সবই ছিল তখন কলকাতায়। যাই হোক, খালি গায়ে ধুতি পরে ইন্দ্র নাচ করবো ঠিক করলাম। গুরুদেবকে বলে একটা ধুতি ও পৈতা আনিয়ে নিলাম, খালি গায়ের উপর সাদা পৈতা বেশ একটা সুন্দর মর্যাদা দেয়। কোন বাজনা নেই, কোন সংগত নেই। আমি করলাম ইন্দ্র, সেই অকল্পনীয় দৈবিক পরিবেশে। সামনের দর্শক ও আমার মাঝখানে ঐ থাম দুটি যার একদিকে রজনীগন্ধার ঝাড় ও অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঘুরে তাকিয়ে দেখছেন আমাকে।

ইন্দ্র ছোট নাচ, কিন্তু যেই শেষ হলো চারিদিক থেকে খালি 'সাধু ?' সাধু !' রব উঠলো।

আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় গুরুদেব তাঁর রচিত আশীর্বচনটি আমায় দেন। তাঁর এই লেখাটি যে শুধুই আশীর্বচন তা নয়, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নির্দেশটিও প্রকাশ পেয়েছে। সেই নির্দেশ ও উপদেশ আমি সারাজীবন আমার কাজের মধ্য দিয়ে পালন করছি। যে নির্দেশটি প্রতিটি নৃত্যশিল্পীকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ তো তাদের জন্যও রয়েছে।

তাঁর সেই অমূল্যপত্রখানি পরে দেওয়া হয়েছে।*

আর একবার রাজু, দেবু, আমার বন্ধু ডা: হাজরা এবং আরো কয়েকজন মিলে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে মিসেস পোদ্দার বলে এক ভদ্রমহিলা একেবারে নতুন একটি অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অটোগ্রাফ নেবেন বলে। কিন্তু সংকোচের জন্য কিছুতেই গুরুদেবকে সেকথা বলতে পারছেন না। তাই মিসেস পোদ্দার আমায় খাতাটি দিয়ে অনুরোধ করলেন গুরুদেবের অটোগ্রাফ এনে দিতে।

গুরুদেব তো আর জানেন না যে খাতাটি কার। তাই আমার হাতে সুন্দর নতুন এক অটোগ্রাফ খাতা দেখে ভাবলেন বুঝি আমারই এবং হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে খস-খস করে লিখে দিলেন খাতাটিতে এক ছোট্ট চার লাইনের কবিতা। আর তার তলায় লিখলেন নাম।

মুহূর্তের মধ্যে আমায় লক্ষ্য করেই তিনি লিখেছিলেন কবিতাটি। আমরা তো সবাই পড়ে অবাক।

কিন্তু মুসকিল হলো—এরপর খাতাটি নিয়ে মিসেস পোদ্দার ও আমার মধ্যে ঝগড়া বাধার উপক্রম। ওঁর খাতা, কাজেই উনি চাইছেন। আর কবিতাটি লেখা আমার উদ্দেশে, কাজেই আমারও সমান দাবি খাতার উপর।

শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হলো। খাতাটি আমার কাছেই রইলো।

যুব উৎসব '৮৫

হাওড়া ডালমিয়া পার্ক

ভারতের সার্থক অগ্রগতি পরিদর্শন করতে
আসুন মেলা প্রাঙগনে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচী (মুক্ত মঞ্চ)

২৩.৩.৮৫ – সম্ভীত কর্তৃক — কবি প্রণাম নৃত্যনাট্য
২৪.৩.৮৫ – হাওড়া জেলা বডি বিল্ডিং এ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক — দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন
পরিচালনায় মনতোষ রায়
২৫.৩.৮৫ – তোপান কর্তৃক — ম্যাজিক
২৬.৩.৮৫ – সংগীত বিতান কর্তৃক — দৃষ্টিদান
২৭.৩.৮৫ – কালপুরুষ কর্তৃক — "আশ্রয়" নাটক

পরবর্তী পর্যায়ে বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
শিবপুর থানার পাশের ময়দান।

আবাসন পরিকল্পনা ভেস্তে দিচ্ছে রাজনীতির মাস্তানরা

শম্পা মির্জানগরের দ্বিতীয় ভাগের কাজ (ফেজ-টু) বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন সেখানে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মগুলো। তাঁরা স্থানীয় থানা থেকে শুরু করে ওসি, এস পি এবং আরো অনেক সরকারি দপ্তরে দরবার করেছেন। অনেক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু একটি সরকার এবং তার তাবৎ পুলিশ বাহিনী ও নানা মাপের রাজনৈতিক দাদারা ব্যর্থ হয়েছে গোটাকয়েক রাজনৈতিক মাস্তানকে সামাল দিতে। শম্পামির্জানগরের এই সরকারি আবাসন পরিকল্পনা অনুসারে ৩৫৬টি বাড়ি তৈরির কথা। কাজের শুরু থেকেই কনট্রাকটররা মাস্তানদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে এসেছেন। দিতে বাধ্য হয়েছেন কারণ পুলিশ এবং সরকার এদের পক্ষে লিখিত ভাবে কণ্ট্রাকটরদের সরকারের তরফ থেকে জানান হয়েছে 'ঝামেলা নিজেদের ভেতর মিটিয়ে নিন।' কিন্তু ১০০০ টাকা করে দেওয়ার পর ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকেনি। এরপরই তারা নতুন দাবি তুলল যে বালি, ইঁট ইত্যাদির যোগানের দায়িত্ব তাদেরকে দিতে হবে। অথচ এ বিষয়ে তাদের না ছিল কোন অভিজ্ঞতা, না ছিল আর্থিক সঙ্গতি। এছাড়া তারা দাম চেয়েছিল বাজারের চেয়ে বেশি।

আবাসন বিভাগের সুপারিনটেনডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এক চিঠিতে জানিয়েছেন, পরিকল্পনা অনুসারে যে এলাকায় বাড়িগুলো তৈরি হবার কথা, বর্তমানে সেখানে সমস্ত ধরণের কাজ বন্ধ আছে। এই চিঠির মেমো নম্বর ৩২২৫, লেখার তারিখ ১৯৮৪-র ১৪ ডিসেম্বর। এই কাজ বন্ধ হবার কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন শম্পামির্জানগর ফেজ-ওয়ান অঞ্চলের টেনাণ্ট অ্যাসোসিয়েসন কার্যরত কনট্রাকটরদের লরি চলাচলে বাধা দিচ্ছে এবং কিছু মাস্তান একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পতাকা সামনে রেখে নানা ভাবে কাজে বাধা দিচ্ছে। এই সংকট থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি সুপারিনটেনডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার কে অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা চালানোর জন্য। এবং একই সঙ্গে তিনি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। তার মতে, কাজ শেষ না করে ৩৫৬টি অসম্পূর্ণ বাড়ির এ ভাবে ফেলে যাওয়ায় অন্য নানা ধরণের সমস্যার উদ্ভব হবে। প্রথমত ওখানে প্রচুর পরিমাণে সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি এখনও পড়ে আছে চুরি যেতে পারে, বা, এর জন্য নিয়মিত পাহারা বসানোর ফলে প্রচুর খরচ বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত একবার এধরণের অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ালে পরবর্তী কালে এই অঞ্চলে নতুন কাজে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মগুলোকে উৎসাহিত করা যাবেনা। এ ছাড়া এ ধরণের অসমাপ্ত বাড়ি দীর্ঘকাল পড়ে থাকলে এই সব অঞ্চল বেআইনীভাবে দখল হলে বা সমাজ বিরোধীরা এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসলে সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠবে।□

শুভাশিস মৈত্র

সংবাদ-সাহিত্য

শৃণ্বন্তু–

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রায় দুই যুগ পূর্বে আমরা কিছু সমালোচনামূলক রচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আজও দেখিতেছি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অজস্র গলদ -- প্রায় একই ধারায় চলিয়াছে। শ্রাবণ ১৩৭০ সংবাদ-সাহিত্য হইতে কিছুটা এখানে তুলিয়া দিলাম। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বক্তব্যই এখানে মুখ্য বিষয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে আরও আলোচনা প্রকাশের চেষ্টা করিব।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার" নামক গ্রন্থে দেখিতেছি ঃ

"পূর্বে দেখিয়াছি, শিক্ষাধিকর্তার নিযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক-নির্বাচন-সংসদ সকল বই আদ্যোপান্ত না পড়িয়া গুরু-লঘু চিন্তা না করিয়া অনুমোদন করেন। সেইরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পাঠ্য-নির্ধারণ-সমিতিরও (Board of Studies) সকল সদস্য সকল বই পড়েন কি না সন্দেহ। মাতৃকা পরীক্ষার নিমিত্ত একখানি বিজ্ঞানের বইতে কেঁচোর জনন-ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কেমনে বালক-বালিকাকে ইহা বুঝাইবেন ? আমি বলিয়াছিলাম, "বিশ্ববিদ্যালয়কে জিজ্ঞাসা করুন।" বি. এ. বাংলা অনার্সের একখানি অতিশয় অশ্লীল পুস্তক পাঠ্য-নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রাম্য ভাষায় 'খেউড়' বলিতে পারা যায়। আমার বিবেচনায় এই বই রহিত করা কিংবা ইহার কিয়দংশ পোড়াইয়া ফেলা উচিত। ছাত্রেরা বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে শিখিতে পারিবে, এই আশায় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু সদস্যেরা লালিত্য-বর্জিত ইংরেজী-বাংলায় রচিত পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন।"

বিদ্যানিধি মহাশয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সবিশেষ প্রয়োজন এখনও অনুভূত হইতেছে।

আর একটি বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দর্শনশাস্ত্র নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় যে বস্তুটি বিরাজ করিতেছে এবং স্কুলের গণ্ডী পার হইতে না হইতেই ছাত্রেরা যে বিদ্যাচর্চার সুযোগ পাইয়া থাকে তাহার সার্থকতা এবং উপযোগিতা কী তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্পর্কে আচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, আমি দর্শনের প্রতি বিমুখ। উত্তম বিষয়ও দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে অযোগ্য হইতে পারে। প্রথম কথা, ১৯।২০ বৎসরের যুবক-যুবতীরা দার্শনিক হইবার অযোগ্য। যদি তাহাদিগকে দর্শন পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহারা তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিবে না; অমুকের মত, অমুকের মত, কতকগুলা মত মুখস্থ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়াদি হইতে যত শীঘ্র এই পরমতপ্রত্যয় দূরীভূত হয়, দেশে স্বাধীন চিন্তার পক্ষে ততই মঙ্গল। তাহারা বলিতে পারিবে না, "এই মতই সত্য এবং তদনুসারে আমাদের জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব।" ছাত্রেরা বুদ্ধির তাৎপর্যের পরিচয় পায়, কিন্তু তাহাদের কর্মক্ষেত্রে তাহা নিষ্ফল। পুনশ্চ, দেশটাই দার্শনিকের দেশ, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রা অতিশয় প্রত্যক্ষ। দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইতেছে না। Ethics নামে বিষয়টি আমাদের ভাষায় ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর আমরা বহুকাল হইতে জানি, ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। কোন্ পণ্ডিত ইহা নির্ণয় করিয়া আমাদের জীবনের পথ নির্ণয় করিতে পারে ? ফলে থাকে কতকগুলি মত আর তর্কের কচকচি। আমি দর্শনের বিরোধী নই, কিন্তু তাহা জানিবার বয়স আছে। অধিশিক্ষায় দর্শন চলিতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষীদের নির্দেশিত পথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চালনা করাই এখন সর্বপ্রধান কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনকে কারনানি ম্যানসনে পরিণত করিয়া বাংলা সাহিত্য বিভাগে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ও কেচ্ছাদার উপন্যাস লেখকদের অধ্যাপকরূপে বসাইয়া দিলে আর যাহাই হউক, ছাত্রদের জ্ঞান অর্জন সুষ্ঠুভাবে কখনই হইতে পারে না।

মানুষের ঠিকানা

ইংরেজের হাত হইতে মুক্তি বা স্বাধীনতা পাওয়ার পর গত প্রায় চল্লিশ বছর, এমনকি এখনও পর্যন্ত বহু লোকের মুখে আমাদের দেশের প্রবল নিন্দা শুনিয়া আসিতেছি। দেশের অমুকটা খারাপ, তমুকটা যাচ্ছেতাই, এটা বিচ্ছিরি, ওটা রাবিশ, ইংরেজের সব কত ভাল ছিল -- এই ধিক্কার বাণী শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া গেল। অথচ আসলে আমাদের দেশের অনেক কিছুই খারাপ নয়, ভাল জিনিস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ভাল-মন্দের ফর্দ দিয়া লাভ নাই। যে পরিস্থিতি বা পরিবেশের জন্য দেশকে নিন্দা করার হয়তো কিছু যুক্তি ছিল তাহা আমরা ধীরে ধীরে কাটাইয়া উঠিতেছি। দেশের কোনটা খারাপ তাহাই নিন্দুকের নিকট জানিতে চাই।

মোটকথা ইহাই আমরা বলিব – দেশের সবকিছুই খারাপ নয়। যে বলে সবই খারাপ 'তাহার কথা মিথ্যা, তাহার মাথায় --' সংবাদ-সাহিত্যের 'দেশ'-নিন্দুক লেখক 'বজ্রাঘাত হউক' বলিতে অক্ষম।

ব্যাপারটা, মানে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিতেছেন নিশ্চয়। ঠিক উপরের অনুচ্ছেদে সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর কথাই বলিয়াছি। অতি সম্প্রতি পত্রিকাটিতে গল্প-

উপন্যাস যেটুকু নজরে পড়িয়াছে তাহার মধ্যে ভাল অর্থাৎ শুদ্ধ সুন্দর পরিচ্ছন্ন রচনা দেখি নাই।

প্রতি সপ্তাহের 'দেশ'-মাইফেলে হঠাৎ যেন খেমটা-গজলের পরিবর্তে কীর্তনের সুর শুনিতে পাইলাম। এক সাহিত্যরসিক বন্ধুর অনুরোধে ২ মার্চের 'দেশে' কণা বসুমিশ্র লিখিত গল্প 'মানুষের ঠিকানা' পড়িয়াই একথা বলিতেছি। গল্পটি সুলিখিত, পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। পাঠক হিসাবে মনে হয় আমাদের চাহিদা পূরণ হইয়াছে। মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি রচনাটি মর্মস্পর্শী, এবং পাঠকের মর্মকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া সম্পূর্ণ সার্থক। কাহিনীর একমাত্র জীবন্ত চরিত্র (বাকি তিনটি গুরুত্বহীন) অদিতি প্রায় বিবাহিত জীবনারম্ভে স্বামীহারা -- দুইটি শিশুকন্যাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার জীবন বহিয়া চলিয়াছে কিন্ত কয়েক বছর পরে স্বামীর সহিত তাঁহার একটা ইন্দ্রিয়াতীত যোগ ঘটিয়া গিয়াছে। লেখিকার রচনাগুণে অদিতি মানুষ হইতে তুচ্ছতম প্রাণীজগতের, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন এক দুর্লভ-সুন্দর চরিত্র। রচনাভঙ্গিতে যে সহজ সরলতা আছে তাহার কিছু অংশ আমাদের পাঠককে উপহার দিয়া লেখিকাকে সম্মানিত করা উচিত মনে করিতেছি।

এক রাজমিস্ত্রির প্রতি লেখিকার দরদী দৃষ্টি ঃ

"সেদিন অদিতির বাড়ি রং করার পর বুড়ো রাজমিস্ত্রী জগদীশপ্রসাদ সারাদিন চূণ, বালি ঘেঁটে যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, অদিতি চমকে উঠেছিলেন। জগদীশপ্রসাদ তার শিরা বের করা রোগা হাতখানা মেলে পারিশ্রমিক চাইছিল। হাতটা থর থর করে কাঁপছিল। তার কপাল, গাল এবং থুতনীর ভাঁজে ভাঁজে বয়সের বলিরেখা। সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আকাশে হাজার পাখির ডাক। তার চোখদুটো করুণ। পিঠটা সামান্য নুয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে। অদিতি চমকে উঠেছিলেন, কেননা উনি যে ওর মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল ঠাকুরকে দেখলেন। পরমুহূর্তেই ওঁর ঘোর কাটল। ওই তো জগদীশপ্রসাদের শরীর, হাত, সেই তো দাঁড়িয়ে আছে। অদিতি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও ভাই।

তার হাতে টাকাটা দিতে গিয়ে উনি তার করুণ চোখ দুটোর মধ্যে কি যেন খুঁজলেন। অদিতির মনে হল, সংসারে কে কাকে ভিক্ষা দেয়? কে কাকে অর্থ দেয়? এই চেতনার জগতের মানুষ, প্রকৃতি অদিতির কাছে কখন ঈশ্বর হয়ে যায়।"

স্বামী দীপঙ্করের চিন্তায় অদিতির স্মৃতিরোমন্থন ঃ

"ওঁর কত ছবি, কত স্মৃতি! ওই মানুষটা হাসছেন। কথা বলছেন। টেপ রেকর্ডে ধরা রয়েছে ওঁর গলা। আর উনি নেই হয়ে গেলেন! তাই হয় নাকি? তবে কি এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের কোন মূল্যই নেই! একটা মানুষ একদিন হেঁটেছেন, বেড়িয়েছেন, কথা বলেছেন – মৃত্যুর পরে সব ফুরিয়ে গেল? কত ঘুম-না-আসা রাত্তিরে একলা বসে থাকতে থাকতে চোখভরা জল নিয়ে অদিতি বলেছেন, আত্মার নাকি মৃত্যু নেই! তুমি এসো। একবার এসে আমার সামনে দাঁড়াও না গো। সেই বুকখোলা পাঞ্জাবি পরে তুমি শুধু একবার আমার কাছে এসো। হাসলে যে তোমায় খুব সুন্দর দেখাত। তুমি একবার হেসে বল না গো, আমি আছি, ছিলাম, থাকব।"

'মানুষের ঠিকানা' জীবন-মরণের এপারে ওপারে একটি রহস্যময় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সুগভীর হৃদয়বেদনাসঞ্জাত কাহিনী, চিত্রই বলা যায়, আন্তরিকতায় নিপুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে আর এক অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, যাহা মানুষকে লোকাতীত জগতে উত্তীর্ণ করিতে পারে -- এই 'চুপি চুপি বলা' গল্পে তাহারই আভাস পাইলাম। সম্ভবতঃ সাগরময় ঘোষের শিষ্য-প্রশিষ্যদের খর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া 'মানুষের ঠিকানা' বহু মানুষের ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষের প্রকৃত ঠিকানা কণা বসুমিশ্র জানেন কিন্ত দেশের বহু লেখকের জানা নাই। ইহাই পরিতাপের বিষয়।

গল্পটির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা দেখিতেছি সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। 'গাছগাছালি', 'পাখপাখালি' এবং 'পাঠ' শব্দগুলি প্রয়োগের ফলে গল্পের রস অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'পাঠ' শব্দটি একেবারে বর্জন করিলেই সংগত হইত।

শীততাপনিয়ন্ত্রণে সাগর জমিয়া বিলকুল বরফ -- প্রায় আন্টার্কটিকা হইয়াছেন অনুমান করিতেছি নহিলে গল্পের শেষে "চায়ের দোকানের ওই ছোকরার" অংশে 'ছোকরার' পরিবর্তে 'ছেলেটির' করিয়া সম্পাদকীয় দায়িত্বের পরিচয় দিতেন। 'ছোকরার' জন্য লেখাটিতে ছন্দপতন ঘটিয়াছে মনে করি।

সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য মস্তিষ্কে গ্রে ম্যাটার উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই। ইস্কাবন হরতন রুইতন চিঁড়েতন -- চারটি টেক্কা, 'A'-র প্রতি অনুরোধ -- যেহেতু সাগরে কুলাইতেছে না, অবিলম্বে মহাসাগরের আমদানি করিয়া দায়মুক্ত হউন।

দীর্ঘকালের প্রয়াসে 'দেশ' যতটা নিম্নগামী হইয়াছিল এই গল্পটির জন্য ঠিক সেই পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী হইতে পারিয়াছে। 'দেশ' বাঁচিয়া থাকুক, আমাদের স্বল্পতর প্রচারসংখ্যা লইয়া 'দেশে'র প্রশংসায় 'দেশব্রতী' বা 'দেশহিতৈষী' হইতে আমাদের আপত্তি নাই। □

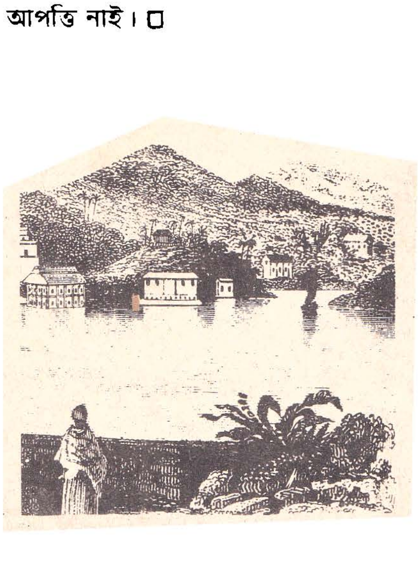

বিবাহযোগ্য পাত্র–পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি–১ ফোনঃ ২৩–৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র–পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র–পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রেExclusive Service এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার ....। যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

–আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since-June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

SANIBARER CHITHI ☐ VOL. 1 NO. 22 ☐ 23 MARCH ☐ Regn. No. 42168/84 ☐ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street, 3rd floor, Calcutta-700 017
Gram : CENTPILES, Telex : CENT IN CA-021-2331
Phones : 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554

WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84